তুমি কোথায়

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কারেণ্ট বুক সপ্
কলকাতা—১২

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অগ্রজ-প্রতিমেষু

এক

মাঠ আর মাঠ! তরঙ্গ চলেছে শুধু মৃত্তিকার!—ধূমাভ, দ্যুতিমান ধরিত্রীর। আর, দুদিকের দিগন্ত সেখানে দর্শক। আর কেউ নেই। কেউ নেই দুটি প্রাণী ছাড়া। হেঁটে-হেঁটে, ছুটে-ছুটে তারা আসছে। আসছে গ্রামের-ই দিকে। কিন্তু গ্রামের প্রবেশ-পথ এখনো আধ মাইলের উপর।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কিন্তু সন্ধ্যার রঙ নেই। আকাশে নেই কোথাও রঙিন-ইঙ্গিত। ব্যস্ত, ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছে বুনোহাঁস। কুৎসিত, কদাকার মেঘ গ্রাস করছে—ধীরে-ধীরে, চুপে-চুপে, মৃত্যুর মতো স্বপ্নময়ী সন্ধ্যাকে। সন্ধ্যার উজ্জ্বল সান্নিধ্যকে। সাপের হাঁ-এর মধ্যে যেন ভীত ভেকের দীর্ঘশ্বাস! কেউ শুনতে পাবে না এখান থেকে—এ-মাঠ থেকে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি।

আলের উপর দিয়ে পৃথিবীর দুটি আদিম সন্তান এগিয়ে চলেছে। আত্মার মতো অত্যন্ত দ্রুত। অত্যন্ত সচকিত তাদের পদশব্দ। কাল কেউটে কি তাদের তাড়া করেছে? কাল কেউটে না হলেও কালো আকাশ তো বটেই!

দু'টি প্রাণী এগিয়ে আসছে। একটি ছেলে, অপরটি মেয়ে।

—তোর ভয় করছে নাকি রে, গৌরী? প্রদীপ এগিয়ে

এল। চেপে ধরলো গৌরীর হাত। —ভয় কী? আমি যখন সঙ্গে আছি, কোনো ভয়েরই তোর কারণ নেই।

উন্মনা গৌরী বললে, না, ভয় কী? তুমি যখন সঙ্গে আছো ভয় কাকে?

—কিন্তু যেদিন সঙ্গে থাকবো না? সে কথা আর জিজ্ঞেস করতে পারলো না প্রদীপ। তার তখন অত বুদ্ধি হয় নি! ফিরছিল তারা মেলা দেখে। লুকিয়ে, বাড়িতে না বলে তারা চলে গেছলো মেলা দেখতে। এ-অঞ্চলে এ মেলার আর জোড়া নেই।

—কেমন দেখলি বল? প্রদীপ বললে।

—খুব ভালো। জবাব দিল গৌরী।

—কোনটা ভালো? নাগর দোলা না ঘোরানো দোলনা; না, সেই ম্যাজিক? সেই পুতুল নাচ!

—সব—সব ভালো। কিন্তু আমার ভয় করছে ভাই!

—কেন?

—বাড়িতে গেলে যদি বকে? মা-বাবা নিশ্চয় এখন খোঁজাখুঁজি করছে। তারা কি দেখতে পেলে এমনি ছেড়ে দেবে?

—কিচ্ছু বলবে না, তুই সোজা বলবি প্রদীপদার কাছে পড়তে গেছলাম!

—তাই বটে! আর যখন জিজ্ঞেস করবে, এই মাটির মহাদেবটা কোথায় পেলি? এই রাংতা দেওয়া মালাটা—তখন কি বলবো?

—তখনও বলবি, এগুলো কুড়িয়ে পেয়েছি !

—আহা মিথ্যে কথা আবার চাপা থাকে নাকি ? তুমিই কোন ফাঁকে সত্যি কথাটা বলে বসবে যখন !

—অত যদি জ্ঞান ছিল তোর টনটনে, আমার সঙ্গে গেলি কেন তবে ? যাবার আগে ভাবতে হত তো।

—তখন কি জানতাম এই রকম অবস্থায় মাঠের মধ্যে পড়তে হবে ! এখন যদি বৃষ্টি আসে !

—আসবেই তো।

বৃষ্টি না এলেও ঝড় উঠলো।···

কুল কুল করে ঝড় উঠলো ধূলোবালি উড়িয়ে। আর নড়ে উঠলো নারকেল গাছ, তালের মাথা, ডোবার জল !

প্রদীপ বললে, বৃষ্টি ? শুধু বৃষ্টি নাকি ? দেখবি, বজ্রপাতও হবে। এই সব আলের পাশে বড় বড় সাপ থাকে। সেই সব বড় বড় সাপ বেরিয়ে আসবে। ঐ দেখ দূরে শ্মশান···অন্ধকারে ওখানে শাঁকচুন্নি কাঁদে। একটু বেশী অন্ধকার হলে আর কী রক্ষে আছে ? এক একটা শাঁকচুন্নি এগিয়ে আসবে আর তোকে ধরবে, আমাকেও ধরবে। সত্যি গৌরী, আমারও খুব ভয় করছে !

গৌরীর মুখের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। স্বয়ং প্রদীপদার যখন ভয় করছে তখন তো আর নির্ভাবনার কথাই নেই !

গৌরী যে ভয়ে কী করবে কিছুই ঠিক করতে পারলো না।

প্রদীপ উপভোগ করলো খানিকক্ষণ গৌরীর মুখের অবস্থাটা। কল্পনা করতে লাগলো তার মনের মতিগতি। তারপর সহসা সে ফেটে পড়লো প্রদীপ্ত হাসিতে। প্রদীপ্ত হাসিতেই উড়িয়ে দিল গৌরীর মনের দুর্ভাবনার মেঘ। বললে, তুইও যেমন, আমি ভয় দেখাতেই তুইও ভয় পাবি ? আর কতোটুকু ? আমরা তো এসে পড়েছি ! ওই তো গ্রাম দেখা যাচ্ছে ! বৃষ্টি নামবার আগেই দেখবি তুই বাড়ি পৌঁছে গেছিস !

তারপর একটু থেমে : আমরা তো এসে গেলাম কিন্তু এখন মেলার কী হচ্ছে বল দেখি ? পরদা-টরদা সব উড়ছে তো ? ধামা-টামাও হয়তো পালাচ্ছে ঝড়ে। আর সেই মেলার খরগোসগুলো ? ভারী সুন্দর, নারে ?

গৌরীর মনে এবার একটু সাহস এসেছিল। সাহস মানেই শান্তি। সাহস আর শান্তি হাত ধরাধরি করে চলে। প্রদীপের হাত ধরে গৌরী বললে, হ্যাঁ ভারী সুন্দর। ঠিক তোমার মতো প্রদীপদা !

প্রদীপ ছোট্ট একটা চড় মারলো গৌরীর পিঠে।

—দূর বোকা ! আমি কী শোলার খরগোস যে, তাদের মতো সুন্দর হবো ?

প্রদীপের পরিধানে ছিল একটা হাফপ্যাণ্ট। গায়ে সার্ট। সার্টের পকেট থেকে প্রদীপ বার করলে দু'টি বড় বড় সন্দেশ, রাংতা দেওয়া। দু'টিই গৌরীর হাতে তুলে দিল।

—নে, খা।

—আর তুমি খাবে না ?

—আমি তো কতো খাই বাড়িতে। তোর জন্যেই মেলায় কিনে লুকিয়ে রেখেছিলাম এই দু'টো। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে। তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল।

—না, প্রদীপদা, তা হয় না। মুখ ভার করলো গৌরী। —তুমিও একটা খাও।

—ওই জন্যেই তো তোর ওপর রাগ হয় আমার! খেতে বললে মারতে আসিস!

ধমকে উঠলো প্রদীপ বিজ্ঞের মতো।

ঝড় মাঝে মাঝে বাড়ছিল। আবার কমেও আসছিলো। গৌরীর মাথার চুলগুলো উড়ে উড়ে ধূলায় ধূসর হল। আকাশের মেঘ অনেক কেটে গিয়ে অন্ততঃ আজকের মতো সাহস দিল দু'টি শিশুপ্রাণকে। অন্ধকার নয়—খানিকটা অলোর আভাসও ফুটলো। ...

গৌরী একটা সন্দেশ শেষ করে বললে, আচ্ছা প্রদীপদা, তুমি আমায় খুব ভালোবাসো, না ?

—তোকে ভালবাসতে গেলাম কি দুঃখে? প্রদীপ বললে, খাচ্ছিস খা। ওসব বাজে কথা কেন আবার?

—তা হলেও তুমি আমায় ভালোবাসো—বলবে না?

—না, কাউকে আমি ভালবাসি না। ভালবাসি শুধু আমি নিজেকে!

—আহা, নিজেকে তো বাসোই আর আমাকেও বাসো

বৈকি! গৌরী থামলো। ফের সুরু করলোঃ সেদিন মা কি বলছিল জানো প্রদীপদা?

—কী বলছিলেন?

—বলছিল, প্রদীপ যদি আমাদের জামাই হয়! সে ভাগ্য কী করেছি? ওদের কতো টাকা, কতো বড় বাড়ি। আমাদের ঘরের গরিবের মেয়েকে ওরা নেবে কেন?

—বড় জ্যাঠা হয়ে পড়েছিস্, না?

প্রদীপ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো নাঃ সেই জন্যেই বুঝি ঘটকালি করতে আমার পিছন পিছন বেরিয়েছিলি!

দু'তিন ঘা কীল বসিয়ে দিল সে আচমকা গৌরীর পিঠে। আর তার ফলে হল কী, গৌরীর সুন্দর মহাদেবটি মাঠের মাঝখাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হল মাটির উপর পড়ে।

আ-হা-হা-হা···

শুধু একটা বোবা আর্ত্তনাদ বেরুলো প্রদীপের অন্তর থেকে!

দুই

পরদিন রাত্রে।

জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে চারিধার। রাত্রি তখন হয়তো ন'টা হবে। এর মধ্যেই নিশুতি হয়ে এসেছে ছোট পল্লীগ্রাম।······

চুপি-চুপি প্রদীপ গিয়ে মাটির বাড়িখানির ধারে দাঁড়ালো। মাটির বাড়ি আর খোলার ছাউনি। এ বাড়িতে গৌরী থাকে। প্রদীপ গৌরীর দেখা পাবার আশায় দাঁড়ালো। একটা কুকুর বাইরের পথেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল। প্রদীপকে দেখে ভৌ ভৌ শব্দে আকাশ মুখরিত করে তুললো। প্রদীপ নিঃশব্দে তাকে থাবড়ি দিল—থাম ভুলো, চেঁচাসনি। আর তাকে চিনতে পেরেই কিনা—কে জানে, কুকুরটাও চুপ করে গেল।

প্রদীপ ছোট একটা শিষ দিল। আর সেই শিষ শুনেই কিনা—কে জানে, বেরিয়ে এল গৌরী। সুশ্রী—যেন একটা ফুলের কুঁড়ি। শুভ্র—যেন একটা সন্ধ্যাতারা!

—প্রদীপদা নাকি? প্রথমেই সুরু করলো গৌরীঃ এত রাত্রে?

—হ্যাঁ, তোকে দেখতে এলাম। কী খবর?

—খবর এখানে দাঁড়িয়ে কী বলবো? ভেতরে আসবে না?

ভিতরে যেতে ভয় ছিল প্রদীপের। তাই চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে গৌরী, কাল ফেরার পর তোকে কেউ কিছু বলেনি?

—বলেনি আবার ? মা কতো ভাবছিল ! আসতেই বকতে লাগলো ! বললে, কোথায় গিয়েছিলি রে গৌরী ? সেই দুপুর থেকে তোর টিকি দেখতে পাওয়া যায়নি। রাত্রি হয়ে গেছে—এখন আসছিস কোথা থেকে ?

—তখন তুই কী বললি ? নিঃশ্বাস চেপে রেখে এ প্রশ্ন করতেই হল প্রদীপকে।

—আমি বললাম, প্রদীপদা আমাকে মেলা দেখাতে নিয়ে গেছলো গোপালপুরে।

—মিথ্যে কথা কেন বললি ? চোখ পাকিয়ে চেয়ে উঠলো প্রদীপ।

—বা, মিথ্যে আবার কোথায় বললাম ? তুমি নিয়ে যাওনি তো কার সঙ্গে গেলাম আমি ?

—আমি নিয়ে গেছলাম ঠিক কথা কিন্তু জোর করে কী তোকে নিয়ে গেছি ? তুই এসেছিলি, তবে না তোকে নিয়ে গেছলাম ? ভারী পাজী হয়েছিস তো তুই !

—বারে, তুমি শুধু আমাকে দোষই দিচ্ছ কেন ? তারপর শোনো, কী হল।

—বল।

—মাকে বললাম, আমিই বলেছিলাম প্রদীপদাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

—সে শুনে তোর মা কী বললেন ? প্রদীপ অনেকটা পথে এল।

—মা বললে, প্রদীপ ছেলে মানুষ—অমন করে যায়? আর কিছু বললে না। শেষকালে শুধু বললে, আর না বলে কোথাও যাস নি, দেখ্‌দেখি তোর জন্যে কতো ভাবছিলাম! জলে পড়লি, কী, কে ধরে নিয়ে গেল—ভাবনা তো হয়ই!

—তাহলে তোর মা আমার ওপর বেশী চটেননি—কী বলিস?

—না না, তোমার ওপর চটবে কেন? মা তোমায় কতো ভালোবাসে!

—এতো গেল কিন্তু তোর বাবা কিছু বললেন না?

—বাবা ঘরেই ছিল না, তা বলবে কে?

—কোথায় গেছলেন?

—বাবা এক বিয়েবাড়িতে গেছলো যে! তাদের বাড়ি বিয়ে ছিল কিনা! এসে দেখলো আমি ঘুমুচ্ছি, কী আর বলবে?

—ঘুমুতে ঘুমুতে তুই বুঝি দেখতে পাস?

—বারে, তা দেখতে পাবো কী করে? তবে সত্যি তো আর ঘুমুইনি, চোখ বুজে পড়েছিলাম যে।

—ও, বড় চালাক হয়ে পড়েছিস তো তুই!

গৌরী বললে, এবার তোমার কথা বলো, শুনি···

—আমার কথা আর কী শুনবি? আসতেই বাবা বকতে লাগলো। বললে, দাঁড়া, ক'ঘা বেত খাবি বল? বড় লায়েক হয়ে পড়েছিস, না? আমি খুব ভয় পেলাম। শেষকালে মা এল······

—তারপর?

—তারপর আর কী শুনবি ? মা থাকতে বাবার সাধ্য কী আমাকে বকে ? ছেড়ে দে—ওসব কথা !

বিজ্ঞের মতো বড় এক নিঃশ্বাস ফেললে প্রদীপ।

একটু থেমে বললে. দেখ গৌরী, বড়ই দুঃখ হল, তোর মহাদেবটা ভেঙ্গে ফেললাম বলে।

—তুমি আবার কোথায় ভাঙলে ? ও তো আমার হাত থেকেই পড়ে ভেঙে গেল। এতে দুঃখু তো আমার-ই হওয়া উচিত, তোমার হবে কেন ?

—তা কি হয় ? আমিই তো কিনে তোকে দিয়েছিলাম, ফের আমিই নিয়ে নিলাম ! যাই হোক, তুই মনে কিছু করিসনি গৌরী, আমি ফের তোকে আর একটা মহাদেব কিনে দেব, কলকাতায় গেলে, কেমন ?

—দিয়ো ! কলকাতায় কবে যাবে ?

—এখন কিছু ঠিক নেই, তবে দাদার সঙ্গে একবার যেতেই হবে।

—এখন যে তুমি এখানে এসেছ, তোমায় কেউ খুঁজবে না ?

—খুজতে পারে। কিন্তু কেন খুজবে বল ? মা-ই তো পাঠিয়েছে আমায়। বলেছে, দেখে আয় তো খোকা, রাম কোথায় আড্ডা মারছে।

রাম মানে প্রদীপদের বাড়ির বুড়া চাকর !

—ও, তাই বুঝি তুমি তাকে এখানে খুজতে এসেছো ?

গৌরীর চোখের তারাদুটি ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

—এতক্ষণে রাম-ই হয়তো আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে—কী বলিস ?

—তা আশ্চর্য নয় ! ওই খোঁজাখুজি করতে করতেই রাতটা তোমার না কেটে গেলে হয় !

প্রদীপ ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, আচ্ছা, আজ চললাম। আবার কাল আসবো, কেমন ?

—এখন একবার ভেতরে এলে পারতে না ?

—দূর, এত্ত রাত্তিরে !

প্রদীপ যাবার জন্যই পা বাড়ালো। কিন্তু শিয়রে শমন !

দোনা দিয়ে পান মুখে পুরে রাম এসে দাঁড়িয়েছে।

রাম বাড়ি ফিরেছিল। গিন্নীমা তাকেই ফের নিযুক্ত করেছেন প্রদীপের খোঁজে বেরুতে।

তিন

মহামায়া ভাত নিয়ে বসেছিলেন।

প্রদীপ এসে দেখা দিল রামের সঙ্গে।

মহামায়া বললেন, হ্যাঁরে তোকে যে পাঠিয়েছিলাম রামের খোঁজে—তা, রাম তো চলে এল কখন, শেষকালে রামকেই পাঠাতে হল তোর খোঁজে? এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

মিথ্যা কথা বলতে প্রদীপের কেমন বাধলো। মিথ্যা না বলে সত্যের যেখানে অপমান নেই—অসম্মান নেই—মিথ্যাই বা কেন সে বলতে যাবে সেখানে? মিথ্যা ঢাকাই বা থাকে কতক্ষণ?

তাই, সত্য কথাই বললে প্রদীপ। —দেখা হয়ে গেল গৌরীর সঙ্গে, তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম······

—কী জিজ্ঞেস করছিলি?

—জিজ্ঞেস করছিলাম—তাকে কেউ মেরেছে কি না···

—কেন?

—কাল তো সে মেলা দেখতে গেছলো আমার সঙ্গে, বাড়িতে তো বলে যায়নি—তাই।

—তা, কি শুনলি? মেরেছে নাকি কেউ?

—না; তেমন কিছু হয়নি।

—কিন্তু দোষটি তো বাবা তোরই! না বলে কি ওরকম যাওয়া উচিত? ছি, আর কখনো যেও না, কেমন?

প্রদীপ চুপ করে এসে খেতে বসলো।

মহামায়া খাবার গুছিয়ে দিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে বসলেন।

এইটিই তাঁর শেষ ছেলে। মানে, ছোট। বড়টি কলকাতায় থেকে ডাক্তারী পড়ে। মধ্যে মধ্যে বাড়িতে আসে। আর প্রদীপ এখন গ্রামের স্কুলে পড়ে। দু'বৎসর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে। তাই এই ছেলেটির উপর মায়ের টান একটু বেশী হওয়া স্বাভাবিক!

মহামায়া মা হিসাবে যে কত সুন্দর, প্রদীপ তা জানে। মায়ের স্নেহও যেমন সুমধুর, শাসনও তেমনি শান্ত। কোনোদিন কোনো কড়া কথা মহামায়া তাঁর এই ছেলেটিকে বলেন না। যা অন্যায়—উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দেন। যা ন্যায়—তার প্রতি তাঁর নীতিজ্ঞানও প্রচুর! এদিক দিয়ে মায়ের কাছে সে অনেক কিছু পেয়েছে। পেয়েছ নয়, লাভ করেছে। নিয়েছে নয়—নেবার দাবি রেখেছে। ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হচ্ছে প্রদীপ কিন্তু মহামায়ার মনে উদারতার অন্ত নেই। তিনি কোনোদিন জানতে দেন নি প্রদীপকে, আমরা ধনী—অপরে নির্ধন। আমরা বড়লোক, অপরে ছোটলোক। যা সয়, তাই রয়। যা সকলের, তাই তাঁর। তাই তাঁদের।

মহামায়া ছেলেকে উচিত শিক্ষাই দেন।

প্রদীপের বাবা কিন্তু বিপরীতধর্মী! তিনি কথা বলেন না

বেশী। ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর সুমধুর সম্ভাষনের নয়। সুগম্ভীর শাসনের। আভিজাত্যের একটা অন্ধ সংস্কারকে তিনি এখনো আঁকড়ে থাকতে পেলে আর কিছু চান না। প্রথম-জীবনে ছিলেন বড় ব্যবসায়ী—তুটো কয়লাখনির মালিক। প্রৌঢ়-জীবনে সে-সব সরিয়ে এখন পড়েছেন শেয়ার নিয়ে। শেয়ার কেনা আর বেচা, কোটেশন নিয়ে চিন্তা করা আর ব্যাঙ্কে চিঠি লেখা, এই তাঁর এখন একমাত্র কাজ। রাজত্বের রাজ্যলক্ষ্মী নেই কিন্তু জিম্মার মধ্যে জমিদারী-কওলা আছে। লাঠিয়াল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে না কিন্তু হাতের শক্ত লাঠিটি এখনো বর্তমান! লাটে জমি-জায়গা উঠুক কিন্তু লাভের কড়ি সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন। কোথাও কোনো গরীব-তুঃখীর তিনি ভালো কখনো চান নি। ভগবান যাদের কষ্ট দেবার জন্য দরিদ্র রূপে দাঁড় করিয়েছেন পৃথিবীতে, তাদের কোনো দাবিকেই স্বীকার করতে তাঁর বাধে। দরিদ্র—নারায়ণ নয়। দরিদ্র দরিদ্রই! সে দৌবারিক হবার ও অযোগ্য। সে দিবাকরেরও অসহ্য! তাই দরিদ্রকে দমিয়ে রাখবার জন্য—দাবিয়ে রাখবার জন্য যাদের ষড়যন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত তাদের সঙ্গে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হতে পারেন হাত মেলাতে।

মহামায়া বললেন, তাড়াতাড়ি করিস্ না, আস্তে আস্তে খা। তুধ দেব শেষ পাতে।

প্রদীপ খেতে লাগলো।—

মা একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তাঁর এই ছোট ছেলেটির

দিকে। ঠাকুর-চাকরের এ-বাড়িতে অভাব নেই অথচ এই ছেলেটিকে নিজে বসে না খাওয়ালে তাঁর তৃপ্তি হয় না। ছেলে আর মা। মহামায়া আর প্রদীপ। পরস্পরের অন্তরের কথা পরস্পরই বোঝে।

মহামায়া পাতে দুধ দিতে দিতে বললেন, হ্যাঁরে গৌরীকে তোর খুব ভালো লাগে, না?

—হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে।

—আর দুর্গাকে?

দুর্গা, গৌরীর জ্যাঠতুতো বোন। একই বাড়ির পার্টিশানের ওপাশে তাদের পরিধি। পার্টিশান তুলেছেন গৌরীর বাবা উমাশংকর নন,উমাশংকরের দাদা শ্যামাশংকর। শ্যামাশংকর পয়সাওলা উকিল। বুদ্ধিও তাঁর পাটোয়ারী। একে পয়সাওলা তার উপর সমাজপতি। উমাশংকর ঠিক তাঁর উল্টো। একে গরিব পুরোহিত, তায় আবার সমাজপতি নন। সমাজ সেবক! সকলেই যদি পতি হয়ে বসেন, তাঁদের বরণ করবার জন্যও তো কিছু প্রতিপত্তিহীন মানুষের প্রয়োজন। পতি হতে গেলেই তাঁর পত্নীর দরকার। আর পত্নী যিনি হবেন নিশ্চয়ই তাঁকে অবলা হতে হবে। সবলা হলে আর যাই হোক, পতির পায়ে তাঁকে মানাবে না। তাই সমাজে থাকতে গেলে ভাগ্য জোরে কাউকে পতি হতে হয়, ভাগ্যদোষে কাউকে পত্নী! ত্যাগই যদি না করতে পারলে, ভোগীকে ভোগ দেবে কী করে? তোমাদের ত্যাগ-ই তো পূজা। তোমাদের জীবন পাত করে পরিশ্রমের

অন্নই তো তাদের পরমান্ন। পূজা আর অর্থ! সেই অর্থ দিয়ে, পূজা দিয়ে ভোগীর চমৎকার ভোগবাসনাকে চরিতার্থ করো। তবে তো পতি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের বর দেবেন। তাই শ্যামাশংকর সমাজপতি। উমাশংকর সমাজ সেবক। গরিব পূজারী ব্রাহ্মণ।

সেই শ্যামাশংকরের-ই মেয়ে দুর্গা। গৌরীর সমবয়সী। পড়সী নয়—প্রতিবেশী। ভগ্নী নয়—ভগ্নাংশ। সখী নয়—সঙ্গিনী।

—দুর্গাকে আমার মোটেই ভালো লাগে না।

প্রদীপ পরিষ্কার স্বীকারোক্তি করলো মার কাছে।

—কেনরে, সে আবার কী করলো?

—জানো মা, দুর্গা মেয়েটা ভয়ানক পাজী। আর শুধু পাজী নয়, আরো একটা ওর গুণ আছে।

—কী গুণ বল দেখি?

কী গুণ—সেটা যেন কেউ না শুনতে পায় এমনি ভঙ্গিতে বললে প্রদীপ। প্রদীপ বললে চারিধারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে—জানো মা? মেয়েটা ভারী চোর।

—চোর? তাই নাকিরে? কিসে বুঝলি?

—একবার কী হয়েছিল জানো? সেবার ঝড়ে অনেক আম কুড়িয়ে ছিলাম। গৌরী আমার সঙ্গে আসতে পারেনি। জ্বরে তাকে খুব কাহিল করে দিয়েছিল। গৌরী বলেছিল, প্রদীপদা, তুমি যদি কাঁচা আম পাও আমাকে চারটি দিয়ো।

আমিও তাই দিয়েছিলাম দুর্গার হাত দিয়ে। কিন্তু দুর্গা কি করেছিল জানো মা?

—কী করেছিল?

—বেমালুম আমগুলো নিয়ে নিজেদের ঘরে লুকিয়ে ফেলেছিল। একটা খোলা পর্যন্ত গৌরীকে খেতে দেয়নি। ভাবো তো কী বদমাস!

মহাময়া একটু চুপ করে রইলেন। হয় তো আপন মনে খানিকটা ভেবে দেখলেন।

পরে হসে বললেন, দুর্গা ভালোই করেছিল মনে হচ্ছে।

—ভালো? কিসে? প্রদীপ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

—ভালো নাতো কি? মহামায়া বললেন, সে-আম খেলে গৌরী বাঁচতো? লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু! জ্বর থেকে উঠে কেউ কাঁচা আম খায়রে বোকা ছেলে? নে, খাওয়া হয়ে থাকে তো ওঠ দেখি। আজ অনেক রাত্রি হয়ে গেল। পড়া-শোনা ভালো করে কচ্ছিস তো? না, কী? দেখবো, যেন্ ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হতে পারিস! শুধু খেলা নয়, পড়া-শোনায় অদ্ভুত ভালো হতে হবে, মনে রাখিস।

—ম্যাট্রিক পাশ করলে কী হবে মা?

প্রদীপ আচমন করে উঠে দাঁড়াল। মাও সঙ্গে-সঙ্গে উঠলেন।

—কী হবে? মহামায়ার চোখ দুটো চক চক করে জ্বলে উঠলো—আশায়, আনন্দে। বললেন, কী হবে তখন বুঝবি।

তারপর একটু থেমে : কেমন দাদার মতো কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়বি। কেমন টুকটুকে বৌ করে দেব তোর —তখন দেখবি।

আর প্রদীপের শিশুমনে যে কথা তখন ভেসে উঠলো, তা আর সে মাকে বলতে পারলো না।

চার

মাত্র দিন চারেকের জন্য প্রদীপ কলকাতায় গিয়েছিল।

ছুটিতে দাদা এসে তাকে নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে করে। এই চারদিনই যেন চতুর্দশ হস্ত দিয়ে বিশ্বের যা কিছু সুধাভাণ্ড তার চোখের সামনে উন্মুক্ত করে ধরেছিল ! এত আলো, এত বাড়ি, এত গাড়ি, এমন গড়ের মাঠ, এত মানুষ, এত ট্রাম, এত বাস, এমন বাঁদর নাচ, আরে বাপরে বাপ। প্রদীপ মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে সেগুলি লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ্য নয়, ভক্ষণ করেছিল ! ভক্ষণ নয়, লেহন করেছিল ! তুনিয়ায় যে এমন এক অপরূপ জায়গা থাকতে পারে, এ তার ধারণাতেই ধরেনি। এ সে কল্পনাতেই আনতে পারেনি।

দাদাকে চুপি-চুপি প্রশ্ন করেছিল : এখানে মহাদেব পাওয়া যায় ?

—মহাদেব কাকে বলে রে ?

দাদার বন্ধুরা একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হেসে উঠেছিলো। দাদা—মানে সন্দীপকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিয়েছিলো—হাঁরে, তোর ভাইটা খুব ভক্ত নাকি ?

দাদা সেকথার জবাব দেয়নি।—তাকে নিয়ে গিয়েছিল চিড়িয়াখানা দেখাতে। নিয়ে গিয়েছিল সিনেমায়, চপ খাইয়েছিল রেস্তোঁরায় আর কালিঘাটে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায়

স্নান করিয়ে একটা সুন্দর রঙচঙে মহাদেবও কিনে দিয়েছিল !

কোথায় সেই মেলা, আর কোথায় এই কলকাতা ! অমন দশখানা গ্রামের একটা মেলা দেখার চেয়ে একটা কলকাতায় এলে অমন একশোটা মেলা দেখা যায় ! সে কথা আর প্রদীপ জীবনে ভুলবে ? এই কলকাতায় তাকে যেকোনো প্রকারে আসতেই হবে। শুধু আসা নয়—এখানেই বাসা বাঁধতে হবে। চারদিনের নয়—এমন অনেক—অনেক দিনের। যতো দিন না কলকাতা পুরাণো হয়। কলকাতা কী কখনো পুরাণো হয় ?

সন্দীপ বললে, তাহলেই বুঝছো তো, তোমায় ভাল ভাবে পাশ করতে হবে। পাশ করতে পারলেই তুমি কলকাতায় আসবে কলেজে পড়তে।

প্রদীপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, পাশ তাকে করতেই হবে। আর পাশ করতে পারলেই সে কলকাতায় আসবে; আর, আরো মজা হবে। সে এই কলকাতার গল্প বহন করে নিয়ে গিয়ে ফেলবে গ্রামে। গ্রামের সেই গৌরীর কানে। প্রজাপতি নিয়ে যাবে পাখায় ভরে পারিজাতের পরিচয়। আর তার কী চাই ? গৌরী অবাক হয়ে শুনবে তার প্রদীপদার কথা। শুনবে না—গিলবে। প্রদীপদার কাছ থেকে আরো, আরো কতো কথাই না সে খোসামোদ করে শুনতে চাইবে। প্রদীপ আর কাউকে কিছু না বলুক, অন্ততঃ গৌরীকে তো সব বলবেই।

গৌরীর জন্য এই চারদিন তার কম কষ্ট হয়েছে নাকি? যেখানেই গেছে, যতোগুলি সে ভাল জিনিস দেখেছে, প্রত্যেক জায়গা আর প্রত্যেক জিনিসটাই তাকে স্বচ্ছল সুখের মধ্যেও সুকোমল পীড়া দিয়েছে! গৌরীকে যদি সে এখানে আনতে পারতো! গৌরীকে যদি সে এসব দেখাতে পারতো! আহা, গৌরী বড় ভালো মেয়ে।

—ওটা কি বাজছে দাদা?

—কোনটা? সন্দীপ কৌতূহলী হয়ে চেয়েছিল প্রদীপের মুখের দিকে।

—ওই যে বাক্সের মতো ওই জিনিসটা, তাকে তোলা রয়েছে?

—ওটা? ওটা হচ্ছে রেডিয়ো।

—রেডিয়ো কি?

—এক জায়গায় গান হয়, কথা হয়, বক্তৃতা চলে আর সারা দুনিয়ায় সেটা ছড়িয়ে পড়ে।

—কৈ, আমরা তো তা দেশ থেকে শুনতে পাই না?

—শুনতে পাওয়া যেতো—যদি ঐ যন্ত্রটা থাকতো। আর শুধু যন্ত্র নয়, ওর সঙ্গে আর একটি জিনিসেরও সংযোগ চাই। হয় বিদ্যুৎ, নয় ব্যাটারী। বড় হলে বুঝবে!

—ও!

ওইতেই খুশি হয়েছিল প্রদীপ। বাড়ি গিয়ে নিশ্চয় একথা সে গৌরীকে শোনাবে।

আর বাড়িতে যখন সে ফিরে এল, তার আনন্দ দেখে কে ?

এ-তো সেই পল্লীগ্রামের প্রদীপ নয়, এ এখন সহরের। সহরের হাওয়া লাগিয়ে এসেছে গায়ে, সহরের ছোঁয়া লাগিয়ে এসেছে হাতে-পায়ে, মুখে, সর্বত্র:. শুধু ছোঁয়া নয়, ধোঁয়াও। টিউব ওয়েলের নয়—খেয়ে এসেছে আসল কলের পরিষ্কার, স্বচ্ছ কাঁচের মতো জল ! এখানকার অন্ধকারের-ই অসহ্য রূপ দেখে-দেখে সে চিত্ত বিনোদন করেছিল, এখন পেয়ে এসেছে উলঙ্গ আলোকের উন্মুদ্র-পরশ ! চান করে এসেছে, শুধু আলোকের তীর্থে নয়, আলোকের ঝর্ণাধারায় ! জামা-কাপড়ে এখনো তার সহরেরই সেণ্টের গন্ধ বিছানো। পল্লীগ্রামের পচা পুকুরের চেয়ে পার্কসার্কাসের পয়োপ্রণালীও কতো পরিষ্কার, কতো প্রীতিময় !

বাড়ি এসেই প্রদীপ মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো। এ যেন তার সে মা নন, এ যেন সহুরে প্রদীপের সম্ভ্রান্ত জননী ! প্রদীপ মায়ের কপালে, গলায় চুমা খেল। চেপে ধরলো তাঁর সুন্দর দুটি চোখ। বুজিয়ে দিল তাঁর সুচারু চোখের পল্লব। সোনার পাতের মতো দুখানি পল্লব। সৌন্দর্যে সুধাময়, স্বপ্নে সুষমামণ্ডিত !

বললে, তোমার জন্যে কি এনেছি বলো দেখি ?

—কি-রে ? কী ? ছেলের আপ্যায়ন তিনি হাসিমুখে সহ্য করতে লাগলেন। একদিন স্বামীর আপ্যায়ন—আজ ছেলের ! আর বললেন, বল না ?

—আমিই যদি বলবো, তাহলে তুমি মা হয়েছিলে কি জন্যে? তোমাকেই বলতে হবে।

—আমি বলতে পারবো না।

মহামায়া মুক্ত করলেন সবলে তাঁর দৃষ্টিপথ আর সহসা মুক্তার মতো হাস ঝরে পড়লো তাঁর মুখ থেকে।

—বাঃ, বেশ হয়েছে তো!

মহামায়া না বলে থাকতে পারলেন না। আর পরম পুলকিত হল প্রদীপ।

—বেশ হবে না? পছন্দ করে কে এনেছে বল?

—তুই বুঝি এনেছিস?

—নিশ্চয়ই!

বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো প্রদীপ। আর মহামায়া একাগ্রদৃষ্টিতে জিনিসটির প্রতি চেয়ে রইলেন। জিনিসটি আর কিছুই নয়—একটা সুন্দর সুশ্রী পেঁচা! ব্রঞ্জের। যেমন তার চাকচিক্য তেমনিই সে চিত্তহারী।

—এত জিনিস থাকতে এ পেঁচাটা এনেছিস কেন বল দেখি?

মহামায়া সস্মিত মুখে তাকালেন প্রদীপের প্রতি।

—সব কথা কী খুলে বলতে হবে?

—না, আর বলতে হবে না।

মহামায়া বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা সহজেই। প্রতি বৃহস্পতিবারই তিনি উপবাসী থেকে লক্ষ্মীপূজা করেন। লক্ষ্মীপূজা করেন ছেলেদের, স্বামীর, গৃহের কল্যাণের জন্য।

লক্ষ্মীর সঙ্গে যে পেঁচাটিকেও তাক থেকে পাড়তে হয়, তাকে পূজা করতে হয়, এটুকু নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিল প্রদীপ। মাটির পেঁচাটা যখন পছন্দ করে কেনা হয়েছিল, তখন তার অবশ্যই যৌবন ছিল, যৌবনের ছিল যাদুকরী চাকচিক্য আর সৌখীনতা! কিন্তু তার মাথায় একাধিক বার নয়—একাধিক দিন জল চাপিয়ে চাপিয়ে বর্তমানে এমনি অবস্থা হয়েছে যে সে-দৃশ্য চোখে দেখতেও কষ্ট হয়! রঙ চোটে রূপ হয়েছে তার বর্ণচোরা, মাথায় টাক ধরেনি, ফাট ধরেছে। লোনা ধরেনি, পোকা ধরেছে! কাজেই প্রদীপের এই পবিত্র প্রয়াস: তাকে বিদায় দিয়ে, তার দেহান্তর ঘটিয়ে অন্য দেহে অন্য মূর্তিতে তাকে দাঁড় করানো।

—বেশ ভালো হয়েছে।—মহামায়া ছেলেকে উৎসাহ দিলেন। আশীর্বাদ করলেন।

আর প্রদীপ আরো পরিত্রাণের পথ খুঁজলো। আরো প্রচুরতম পরিব্যাপ্তির!

—আচ্ছা মা, প্রদীপ প্রশ্ন করলো: এমন সুন্দর কলকাতা সহর থাকতে. আমরা কেন গ্রামে পড়ে আছি? আমরা কী সহরে গিয়ে থাকতে পারি না? সেখানে কতো আলো, কতো সিনেমা, কতো ছেলে, কতো আমোদ! কতো দোকান···কতো বাজার! আর এখানে কী?

মহামায়া সায় দিতে পারলেন না প্রদীপের এই প্রগল্ভতায়।

—ছি বাবা, ছু'দিন সহরে গেলেই কী সহর বুঝতে পারা যায়? এই সব গ্রামগুলোই তো সহরকে রেখেছে। গ্রাম না থাকলে সহর থাকতো কোথায়? আজ আমরা যে, গ্রামে বাস করে গ্রামকে ভালবাসতে পারছি না, কে জানে সেইটাই একদিন ভালো সহর হয়ে উঠবে কিনা!

—সহর হতে পারে কিন্তু কলকাতা তো হবে না!

—তার জন্যে ছুঃখ কী তোর? তুই তো পাশ করলে কলকাতায় যাবিই! তখন সহর আর গ্রাম--ছুটোতেই তো তোর যাতায়াত থাকবে সমানে।

—কিন্তু কলকাতায় গেলে তো তোমায় পাবো না! সেখানে তুমি কৈ? সেখানে আর সব কোথায়? তখন আমার কতো ছুঃখ হবে বলো দেখি?

—ছুঃখ অত সহজ করলে বাঁচা চলে না। কিন্তু আর কাকে চাস সেখানে? গৌরীকে? হ্যাঁ, ভালো কথা। গৌরীর জন্যে কিছু আনিসনি?

—আনিনি আবার? এনেছি বৈকি······দেখাবো?

—দেখা দেখি···

মহাদেবটিকে দেখে মহামায়া সত্যই ভারী খুশি হলেন! বললেন, এটা গৌরীর মনে ধরবে তো?

—মনে ধরবে না মানে? প্রদীপ হাতের আস্তিন গোটালো। —পায় না পচা পুঁটি, খেতে চায় ঘী রুটি! মনে না ধরলে ওর কানে ধরবো না আমি?

—তা না হয় হল কিন্তু ওসব কথাগুলো কোথায় শিখলি ? মহামায়া শুনে আহত হলেন।

—কোন্ সব কথা ? পায় না পচা পুঁটি…? ও-সব ইস্কুলের ছেলেদের কাছে শিখেছি।

—কিন্তু ও-সব কথাগুলো খারাপ। বলতে নেই। অমন করে বলে না, কেমন ?

মহামায়া ছেলেকে শাসন করলেন আর বললেন, কাল বিকেলে গিয়ে ওটা গৌরীকে দিয়ে আসিস।

পাঁচ

বিকাল পর্যন্ত আর বোধ হয় অপেক্ষা করা গেল না।—

যাকে যা দেবার শীঘ্র দিলেই শান্তি। যা শুভ শীঘ্রই তা সম্পন্ন করা শোভন। যা ধ্রুব, শীঘ্রেও যা বিলম্বেও তাই। স্কুলের সেদিন ছুটি। প্রদীপ অপরাহ্ণেই মনস্থ করলো বেরিয়ে পড়বে গৌরীর সন্ধানে। মহাদেবটিকেও পেট কাপড়ের মধ্যে পুরে নিল। তারপর আর কী! এটুকু পেরুলেই পথ। এই পথটুকু পেরুলেই পরমার্থ! তারপর গৌরী আর প্রদীপ! প্রদীপ আর গৌরী! পূজারী আর প্রতিমা! পথরেখা আর পান্থপাদপ! তারপর কতো কথা, কলকাতার কতো কাব্যোচ্ছ্বাস! সহুরে গগনের কতো গুণকীর্তন! গৌরী শুনবে। শুনবে না, গিলবে। প্রত্যেকটি অক্ষর, প্রত্যেকটি শব্দ—যা ইথারে ইথারে লীন হয়ে যায়, যা মাটিতে মাটিতে বৃষ্টির বিলেপন আনে। তারপর এই মহাদেব—রঙচঙে মহাদেব পেলেই গৌরী গরবিনী সমুদ্রের মতো সমুচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। আর তখন প্রদীপ দুহাত দিয়ে গণ্ডূষ করবে, গণ্ডূষ করবে অনুভূতির গভীর রসধারা। যা নিষিক্ত করবে জীবনকে, জীবনের সমৃদ্ধ স্বপ্নকে!

কিন্তু ঠিক বেরুবার পথেই বাধা। যাত্রার প্রারম্ভেই

ভরাডুবি! সিঁড়ি দিয়ে জাহাজে ওঠবার পথেই সিঁড়ি গেল সাত হাত গভীরে তলিয়ে!

সামনেই বীরেন্দ্রকিশোর দাঁড়িয়ে। প্রদীপের বাবা বীরেন্দ্র-কিশোর।

আজ ক'দিন ধরেই বীরেন্দ্রকিশোরের মনটা রুগ্ন। প্রাণটা পীড়িত। প্রাণ আর মন—দুটোরই সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর! দুটোই ভালো থাকতে পারে যদি অবশ্য ভালো খবর থাকে। ভালো খবর মানে—ভালো আয়, ভালো অর্জন, ভালো ইজ্জৎ! কিন্তু সে কৈ? শেয়ার বাজারে আগুন লেগে গেছে! সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিকবিদিকে, দেশে দেশে! বোম্বে থেকে কলকাতায় ট্রাংকল আসছে। চীৎকার করে করে নিশাচর দু'দালাল পৃথিবীর দু'প্রান্ত থেকে মুখোমুখি হয়েছে। খবর নিচ্ছে, খবর দিচ্ছে! আয়রন-২৭৲। ষ্টীল-১৮৲। বেঙ্গল নাগপুর-১৯৲। এলগিন-১৫ রুপেয়া ছে আনা। হাওড়া-৩১৲ পাঁচ আনা। র‍্যালী ব্রাদার্স-১০৫৲। জার্ডিন হ্যাণ্ডারসন-১৪৯৲। মার্টিন বার্ণ-১৮ রুপেয়া দো আনা। হায় হায় হায়! হল কি? গেল—গেল বুঝি সব!

যাবার এখন কী দেখছো? টাকা মাটি—মাটি টাকা করে ছাড়বে! আর কাজ পেলে না, শেয়ার নিয়ে কারবার করতে নেমেছ? কতো টাকা তোমার মূলধন? পাঁচ কোটি হবে? মোটে পঞ্চাশ হাজার? ফুঃ! মাড়োয়ারীরা তো তোমায় এক ফুংকারে উড়িয়ে দেবে? উড়ে গেলে কোথায় পড়বে ভাবো।

ভাঙা এরোপ্ল্যান থেকে আর্টল্যানন্টি:ক ! না, আরব উপসাগরে ? না আরো কাছে ? দমদমের দক্ষিণ দিকে ? না, যমালয়ের জঠরানলে !

আরে আরে—একি হল ! পড়লো তো পড়লো, শুধু শেয়ারই নয়। তার সঙ্গে জি. পি. নোটও যে যোগ দিয়েছে ! একি অনাছিষ্টি ! একি অনর্গল অবিচার ! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেট বাড়াল। তার ফল কী এই ? ৩%-১৯৪৬ বলে কি ? মাত্র ৮১৲ টাকা ? আজ ৮১৲, কাল হয়তো ৮০৲। কিছুই আর বিশ্বাস নেই। কিছুতেই বোধ হয় আর সময়কে শুইয়ে রাখা গেল না। যে ছিল ঘুমন্ত, সে এখন ছুটন্তর দলে। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়েই হয়তো হামবড়া হয়ে পালাতে সুরু করেছে। একটুও ভয় করছে না হাঙ্গর কুমীরের। ভীষণ—ভয়ঙ্কর ভূত-প্রেতের। নাঃ, জীবনে আরো যে কতো কষ্ট আছে, কতো যন্ত্রণা, জীবন দেবতাই জানেন।

আজ সকালেই ফের আর একখানা চাঞ্চল্যকর চিঠি এসেছে ব্যাঙ্ক থেকে। ব্যাঙ্ক পর্যন্ত বাঙময় হয়ে উঠেছে। বাচাল হয়েছে। তার এই ব্যস্ততা যদি সমূলে শেষ করে দিতে পারতেন বীরেন্দ্রকিশোর তবেই হয়তো সান্ত্বনা মিলতো। শান্তি পেতেন। কিন্তু সান্ত্বনা কোথায় ? কোথায় শান্তি ? ব্যাঙ্ক হুমকী দিয়েছে, যদি তিন দিনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পয়সা অথবা সেই মূল্যের সিকিউরিটি না পাঠাও তাহলে আমরা বাধ্য হব কিছু শেয়ার তোমার বিক্রী করতে। বিক্রী

করে খাতা ঠিক রাখতে। আমরা দুঃখিত, আমাদের পক্ষে আর সময়ক্ষেপ করা সম্ভব নয়।

এরকম চিঠি এর আগেও এসেছে। তখন বীরেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন, টাইটেল ডিড্‌স অথবা ইনস্যুরেন্স পলেসি বাঁধা রেখে বিপদ এড়ানো সম্ভব কিনা। কিন্তু তার উত্তরে ব্যাঙ্ক তখনো বিন্দুমাত্র কারুণ্য প্রদর্শন করেনি। সরাসরি জবাব দিয়েছিলো—**The business will not suit us.** এই তো ব্যাপার। বিপদ এলে কী এই রকম ভাবে তার বিপর্যস্ত মূর্তি নিয়ে সে শাসিয়ে ফেরে? ফেরেই তো!

দশবছর আগের একটা কথা মনে পড়লো বীরেন্দ্রকিশোরের। তাঁর জনৈক বন্ধু গল্প করেছিলেন। হালে এখন তিনি খুব বড় লোক। কিন্তু তখন তিনি ছোটরও ছোট ছিলেন। (বড় লোক না হলে বীরেন্দ্রকিশোর তাঁর গল্প কেন শুনবেন?) গল্প করেছিলেন—চার আনা পয়সা নিয়ে বাজার করতে গেছি। দু'আনার মাছ কিনেছি আর বাকী আছে দু'আনা—তরকারি কেনবার জন্যে। সব কিনে—মুলো কিনতে গিয়ে শেষ এক আনা পয়সা দিলাম। মুলো নিয়ে চলে আসছি, দোকানী বললে, ও মশাই, পয়সা দিলেন না? শোনো কথা! পয়সা তো এই মাত্র দিলাম!

—না, আপনি দেননি।

—তবে কী আমি মিথ্যে কথা বলছি?

—আমিই কী তবে মিথ্যে কথা বলছি?

—নিশ্চয় বলছো। আলবৎ দিয়েছি পয়সা।

—কখখনো না। আমি বলছি আপনি পয়সা দেন নি!

দোকানীর মাথাটা ফাটিয়ে দিলেই হয়তো ভালো হ'ত! কিন্তু তিনি তা করলেন না। সব মুলোগুলোই ঢেলে দিয়ে চলে গেলেন। পশ্চাতে ফেলে গেলেন পিচ্ছিল পরিহাস!

ভাগ্য খারাপ হলে এমনিই হয়! বিপদ যখন আসে, বিপর্যস্ত করে এই ভাবেই! বিপন্ন করে এই মানুষকেই। যে মানুষ একদিন বেঁচে থাকলে হয়তো সব বিপদ কাটিয়েই বিশাল হয়ে উঠতে পারে জনসমাজে। বিপুল হয়ে উঠতে পারে বিশ্বসভায়। কিন্তু বেঁচে থাকলে—তবে! দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে কী দোলাই না দিয়ে যায়। এই দুঃখ সয়ে যে বেঁচে থাকাই দুর্ঘট!

বীরেন্দ্রকিশোর ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। আকাশের সীমানায় যদি কোনো সংকীর্ণ সংকেত থাকে, যদি থাকে কোনো সস্মিত সান্ত্বনা, তারি সন্ধানে। আর সহসা দেখতে পেয়ে গেলেন প্রদীপকে।

প্রদীপ পা টিপে টিপে চলেছে। কোথায় চলেছে তা হয়তো তিনি বোঝেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না ওর পেটের জামাটা অত উঁচু হয়ে উঠেছে কেন। তিনি বললেন, দাঁড়া, কোথায় চলেছিস?

প্রথমে তো কোনো কথাই বলতে পারলো না প্রদীপ। শুধু ঘামতে লাগলো।

বীরেন্দ্রকিশোর ছোট একটা হুঙ্কার করলেন আপন মনে। তারপর বললেন, হুঁ···বুঝেছি।

একটু থেমে : পেটের মধ্যে তোর ওটা কী আছে ?

অপরাধীর মতো শুধু বার করে দেখালো প্রদীপ মাটির মহাদেবটি।

—হুঁ, হয়েছে। ঘরে যা। তোর মাকে ডাক।

বীরেন্দ্রকিশোর ছেলেকে কিছুই আর বললেন না। মহামায়া আসতে তাঁকে শুধু ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, বসো··· ঐ চেয়ারটায়।

মহামায়া বসলেন।

ততক্ষণে প্রদীপ গিয়ে বই নিয়ে বসেছে অন্য ঘরে।

আর বীরেন্দ্রকিশোর কি বলবেন মহামায়াকে তাই ভাবতে লাগলেন। তাঁর লাভ লোকসানের কথা নিয়ে কখনোই তিনি মহামায়ার সঙ্গে পরামর্শ করেন না। সে ধাঁচের লোকই নন তিনি। যারা নরম হয়ে নেতিয়ে পড়ে স্ত্রীর পায়ে, বলে—ওগো বলে দাও, আমি কি করবো, তিনি সেই নির্বোধের দল থেকে নির্মুক্ত। তিনি সে-দল থেকে দলছাড়া। তাই বলে তিনি অবজ্ঞাও করতে পারেন না মহামায়াকে। মহামায়ার যুক্তি তর্ক নির্ভুল। বিচার নিরপেক্ষ। শেষ পর্যন্ত যদি পরামর্শ করেনই তবু মহামায়ার মতকে অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে অসাধ্য। মহামায়া মায়া দিয়ে বীরেন্দ্রকিশোরকেও জয় করেছেন।

সে-বলে তিনি বলীয়সী। সে-অহঙ্কার তাঁর পদভূষণ নয়,

সে-আস্তর্য তাঁর জয় পতাকা। সে অহঙ্কৃতির তিনি একাই উত্তরাধিকারিণী।

অনেকটা সময় কাটিয়ে বীরেন্দ্রকিশোর বললেন, আমি বুঝতে পারছি না ছেলেটার এমন মতি গতি কেন হল।

—কী রকম মতি গতি ?

—বাপ হয়ে আমি যা বুঝতে পারছি, মা হয়ে তোমার কী তা বোঝা এত শক্ত ?

—ছেলের জন্যে বাপ, মেয়ের জন্যে মা। ব্যাপারটা খুলে বলো।

—খুলে আর কতো বলবো ? তোমাকে কতোদিন না বলেছি ছেলেকে বারণ করতে ও-পথ যেন সে না মাড়ায় ? তুমি বারণ করেছিলে ?

—ওপথ মানে, গৌরীদের বাড়ি যাওয়া তো ?

—গৌরী-ফৌরী বুঝিনা। ওই টিকিওলা ভটচায্যি বামুনটাকেই আমি ঘৃণা করি।

—কেন, গরিব বলে ; না টিকিওলা বলে ?

—দু'কারণেই।

—কিন্তু যদি বলি ও এখন আর গরিব নেই, আর টিকির বদলে শীগগিরই টাক পড়বে —তা হলে ?

—তার মানে ?

—তার মানে ধরো গিয়ে ও একটা লটারীর মোটা টাকা পেয়েছে। টাকা পেলেই তো টাক পেতে পারে।

—তোমায় কী রসিকতা করবার জন্যে এখন ডেকেছি?

—তাছাড়া তোমার সঙ্গে আর বুড়োবয়সে কী সম্পর্ক আছে? রস মরে যায় কিন্তু রসিকতা থাকে।

—ওসব আমি বুঝি না। উষ্ণ হতে গিয়েও বীরেন্দ্রকিশোর নরম হলেন। বললেন, তুমি এখন বুঝছো না কিন্তু উত্তরকালে এর কি পরিণাম দাঁড়াবে—জানো?

—জানি না আবার? গৌরীর সঙ্গেই হয়তো বিয়ে হবে প্রদীপের।

—বিয়ে? ছোঃ! বিয়ে বোলো না, বল ব্যাভিচার। আমি বেঁচে থাকতে ও গরিবের মেয়েকে এবাড়িতে আনতে পারবো না, এ তুমি নিশ্চয় দেখে নিয়ো।

—কিন্তু ভবিষ্যতের কথা নিয়ে বর্তমানে বাড়াবাড়ি করে লাভ কী? এমনও তো হতে পারে, হয়তো আমরাই খুব গরিব হয়ে গেলাম; ওরা দিল না ওদের মেয়েকে আমাদের বাড়ি। এমনও তো হতে পারে, হয়তো বাঁচলো না আমার ছেলে ত্ু'বছর বাদে। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে কী লাভ? আর তাছাড়া ছেলে মেয়ে থাকলেই ওদের ভাব হয়। ওরা খেলা করবেই। তুমি বাধা দিতে পারো না। আমার যদি বাধা দিতে ইচ্ছা হয়, বনে গিয়ে বাস করতে হবে। মনুষ্যসমাজের উপযুক্ত হতে গেলে সব মানুষের সঙ্গেই আদান-প্রদান অনিবার্য।

—কিন্তু আদানের বেলায় তো কাঁচকলা, প্রদানই তো

প্রধান হয়ে উঠেছে এখন। প্রদীপ যে পেটে করে কী নিয়ে যাচ্ছিল—সেটা কার?

—সেটা একটা পুতুল। পাঠিয়েছিলাম গৌরীকে দেবার জন্যে।

—ও! তুমি!

বিষহীন সাপের মতো ছোট হয়ে গেলেন বীরেন্দ্রকিশোর। তবু গর্জন করতে ছাড়লেন না। বললেন, আসছে বছরের ভিতরেই সন্দীপের বিয়ে দেবো। একটা মোটা টাকার আমার দরকার। সে ব্যবস্থা আমি শীগ্‌গিরই করছি।

ছয়

দিন তিনেকের জন্য গৌরী গিয়েছিল বাবার সঙ্গে তাঁর শিষ্যবাড়ি।

গৌরী জানতো বাবার অবস্থা খারাপ হলেই তিনি ছোটেন শিষ্যবাড়ি। সেখান থেকে বাবা কতো কি সঙ্গে আনেন। আনেন টাকা পয়সা, কাপড়-চোপড়। চাই কি গাছের এক কাঁদি কলা, ক্ষেতের চারটি মুলো, চারটি আলো চাল আরো কতো কী! এখানে যে-যে বাড়িতে প্রত্যহ তাঁকে পূজা করতে হয়, শীতল দিতে হয় সন্ধ্যায়—তারও একটি ব্যবস্থা করে যান বৈ কি! অন্য পুরোহিত ঠিক করে যান। বাবার পাওনা দুধটা তাঁরাই গ্রহণ করেন। বাবার পাওনা দু'টো একটা পয়সা—তাঁরাই বা ছাড়বেন কেন? আবার তাঁদের বেলায়ও বাবাকে থাকতে হয় বিশ্বস্ত। তাঁদের অসুখে, তাঁদের অনুপস্থিতিতে বাবাকে একটু খাটতেই হয়। এই ভাবেই নারায়ণের দয়ায় সংসার চলে! সংস্থান বলতে কিছু নেই, স্বচ্ছল বলতেও লজ্জা হয় তবু সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় নিয়মতান্ত্রিক ভাবে। যার যেমন মূলধন—তার তেমন মূল্য। সেদিক দিয়ে স্বভাবে যেমন উমাশংকর নন উদ্ধত, উচ্চাশার ব্যাপারেও তিনি নন তেমন উদব্যস্ত।

সময়টা যেমন খারাপ পড়েছে আর স্বাস্থ্যটাও যেমন উমাশংকরের ইদানিং খারাপ যাচ্ছিল তাতে ত্রিলোচনার আর ইচ্ছা ছিল না স্বামীকে দূর গ্রামে পাঠান ভিক্ষা করতে। তবু, তিনি যখন গেলেনই, গৌরীও এবার জিদ ধরলো—আমি যাবো সঙ্গে।

গৌরী গেল। আর সে কী যত্ন! শিষ্যরা শূদ্র। দলে দলে এল গুরুমশাইকে প্রণাম করতে। শিষ্যদের বাড়ির বৌ-ঝিরা এল জল নিয়ে। গুরুমশাইয়ের পা ধুয়ে দিতে লাগলো নিজেদের হাতে। নিজেদের আঁচল দিয়ে সে-পা মুছিয়ে দিল। আর গৌরীকেও ঘরে তুললো তারা সমান যত্নে, সমান আদরে।

আসল শিষ্য গণেশ যে কী করবে, কিছুই ঠিক করতে পারলো না। প্রচুর তালআঁটি কাটলো, বাতাসা দিয়ে জল দিল, গরুর খাঁটি দুধ বালতি ভর্তি দুয়ে নিয়ে এসে জ্বাল দিয়ে সামনে ধরলো।

উমাশংকর শিষ্যকে দেখিয়ে বললেন, এই আমার মেয়ে, দশে পড়েছে। এর নাম গৌরী!

—আহা বড় ভালো মেয়ে! মায়ের কী রূপ।

গণেশ তাকে দেখে-দেখে যেন আর চোখ ফেরাতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো, তা পণ্ডিত মশাই, গৌরী মাকে গৌরীদান করবার তো সময় হয়ে গেছে, দিয়ে ফেলুন না।

—দেবরে বাবা! দেব! অদৃষ্টের উপর তো আর হাত নেই।

ঘরভর্তি ধান, বাড়িভর্তি মরাই। চারিধারে যেন লক্ষ্মী বাঁধা। অনেক রাত্রে লক্ষ্মী-পেঁচা ডেকে যায় আমগাছে বসে।

রাত্রে গৌরীই রান্না করলো। শূদ্রের হাতে তো গুরুদেব খেতে পারেন না। তাই ওরা জোগান দিল আর রান্না করলো বাবার বদলে গৌরী।

দুদিন কি সুখেই না রইলো গৌরী সেখানে। কিন্তু নানা জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে আসবার সময় প্রদীপদার জন্য গৌরী বেশ উতলা হল। এখানে আসবার কালে গৌরী শুনেছিলো প্রদীপদা কলকাতায় গেছে বেড়াতে। তাকে বলে যায় নি। নাই বা গেল। কিন্তু গিয়ে তো সে দেখতে পাবে প্রদীপদাকে। আর, এটা ঠিক, প্রদীপ কলকাতা থেকে নিশ্চয় তার জন্য কিছু না কিছু আনবেই।

বাড়িতে এসে দুর্গার মুখে সে খবর পেল—প্রদীপদা ফিরেছে। আর আশায়-আনন্দে সে রইলো উৎকর্ণ হয়ে—কখন প্রদীপদা তাকে ডাকবে!

একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল,—একসপ্তাহও কেটে গেল কিন্তু প্রদীপ না এল গৌরীর কাছে, না করলো তার সঙ্গে দেখা।

এর কী কারণ—গৌরী হাজার ভেবেও বুঝতে পারলো না। সে কী কোনো অপরাধ করেছে? না, প্রদীপদার বাবা মানা করেছেন তাকে এখানে আসতে?

একটা কিছু জানতে পারলেও যে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে!

দুপুরে অনেক সময় চিলেরা উঁচু গাছ থেকে শিস দিয়ে ডাকে আর গৌরী ছুটে যায়। ভাবে বুঝি প্রদীপদা তাকে ডাকছে কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখে, কোথাও কিছু নেই। একটা বেড়াল হয়তো কারো ঘরের পোরোলে উঠে গেছে তাদের হাঁড়ি মারতে। একটা কুকুর হয়তো হাঁ করেছে—যন্ত্রণাদায়ক মাছিটাকে খেয়েই ফেলবার জন্য। একটা শুয়া-পোকা হয়তো গুটি গুটি নেমে আসছে সজনাডাল থেকে। আর, চারিধার নিস্তব্ধ, চারিধার নিঃসঙ্গ! মধ্যাহ্নের দিবাকরের মতোই দিঙ্মণ্ডল সাথিহীন।

গৌরী আর পারে না।

কী ভাগ্য, রামের সঙ্গে গৌরীর একদিন দেখা হয়ে গেল।...

এ যেন প্রদীপদের বাড়ির চাকর নয়, প্রদীপদার প্রতীক। গৌরী ছুটে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা প্রদীপদার খবর কী?

—কেন, ভালোই তো আছেন।

—কিন্তু আর আমাদের বাড়ি আসে না কেন বলতে পারো?

—তা তো জানিনা। শুধোব এখন।

—বেশ, শুধিয়ে খবরটা আমায় তাড়াতাড়ি দিয়ে যাবে তো?

—যাব।

দুদিন পরে ফের দেখা রামের সঙ্গে।

—কৈ কিছু তো বললে না? প্রদীপদা কি বললে তুমি তো এসে বলে গেলে না?

—আমি ভুলে গেছলুম তাকে শুধোতে।

—তুমি শুধু শুধোতেই ভুলে যাও, না খেতেও ভোলো?

রাম কেবল সরল অন্তরে একটু হাসলো। আর তার হাসি দেখে গা জ্বলে যেতে লাগলো গৌরীর।

পরদিন গৌরী মা-কালীর ছবি দেখে ঘুম থেকে উঠলো। ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করলো, লক্ষ্মী মা আজ যেন প্রদীপদার সঙ্গে আমার দেখা হয়ই। এইটুকু তুমি দয়া কোরো।

আর সেদিন প্রদীপের সঙ্গে অব্যর্থরূপে দেখা হয়ে গেল গৌরীর বেলাবেলি। বেলাবেলি মানে প্রদীপ তখন স্কুল থেকে ফিরছিল।

দৌড়তে দৌড়তে—হাঁপাতে হাঁপাতে···হোঁচট খেতে খেতে গৌরী গিয়ে ধরলো প্রদীপের একখানা হাত। কিন্তু এভাবে যে সে প্রত্যাখ্যাত হবে···হতে পারে—ভুলেও আশা করেনি।

এ-প্রদীপ যেন সে-প্রদীপ নয়। এ প্রদীপ যেন সে প্রগলভ নয়। এ প্রদীপ মুখর নয়—মৌন। এ-প্রদীপের এ-মুখ নয়, এ যেন তার মুখোস।

—প্রদীপদা, তোমার কী হয়েছে? তুমি আর আসো না কেন আমাদের বাড়ি? তোমার বাবা কী বারণ করেছে আমাদের কাছে আসতে? কলকাতা থেকে এলে—একবার দেখা পর্যন্ত করলে না? কতো তোমাকে খুঁজছি।···

কতো প্রশ্ন যে গৌরী এক সঙ্গে, এক মুখে করে গেল তার আর ঠিক-ঠিকানা রইল না। কিন্তু প্রদীপ না দিল একটা কথার জবাব, না চাইল গৌরীর দিকে।

হন হন করে সে শুধু হেঁটে গেল পাল্কীবাহীর মতো।

নিষ্ফল আক্রোশে, অন্ধ অভিমানে গৌরী ফুলতে লাগল। ফুলতে লাগলো যতক্ষণ পর্যন্ত না দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হল প্রদীপ। রেললাইন থেকে অদৃশ্য হল রেল-গাড়ি। এ-ও কী সম্ভব? কী হয়েছে প্রদীপদার? একটা কথাও তো তার বলা উচিত ছিলো। অথবা দু'টো গালিগালাজ! গালভরা গালিগালাজও যে অনেক সময় ইঙ্গিত দেয়, ইসারা আনে মানসিক ইতিকথার!

গৌরী আর দাঁড়াল না। দাঁড়াতে পারলো না পথের উপর।

চোখ দুটো তার জলে ভরে এল। চোখের তারা দুটো তার জলে ঝাপসা হয়ে গেল।...গৌরী ফিরে এল তার নিজের বাড়িতে। নিবূ্যঢ় নিঃসঙ্গতায়। নির্জন গৃহ কোণে। আর তার শুকনো মুখের সজল শ্রাবণ-ধারায় কৌতুহলী হয়ে উঠলেন ত্রিলোচনা।

—কিরে, কী হয়েছে গৌরী? কাঁদছিস কেন মা?

গৌরী কথা বলে না।

মা পুনরায় যখন জিদ ধরলেন, গৌরী ফেটে পড়লো অভিমানে।

—প্রদীপদা আমার সঙ্গে কথা বললে না।

—এই ব্যাপার! আশ্বস্ত হলেন ত্রিলোচনা।—কিন্তু প্রদীপ তো কদিন আগে এখানে এসেছিল।

—কবে? চোখ মুছতে মুছতেই প্রশ্ন করলো গৌরী।

—তুই তখন শিষ্যবাড়ি গেছলি। প্রদীপ এসেছিল কী একটা জিনিস নিয়ে যেন। আমায় বললে, কাকীমা, গৌরী নেই? আমি বললাম, না, কাল আসবে। সেই শুনেই সে চলে গেল। আমি বললাম, বোসো না বাবা। সে বললে, আবার আসবো।

গৌরী কী বুঝলো কে জানে কিন্তু দুঃখ কী এত সহজেই দূর হয়? কাঁটা ফুটলে বার না হয় করা হল কিন্তু ব্যথা কী এত সহজেই মরে?

সাত

মহামায়া একাকিনী বসে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন-চরিত পড়ছিলেন। বেলা তখন দুটো। বীরেন্দ্রকিশোর কলকাতায় গেছেন ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপোষ করতে।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলেন ঠিক এমনি সময়—ত্রিলোচনা।

মহামায়া সাদরে তাঁকে বসালেন। বসতে দিলেন আসন পেতে। এর আগেও দু'একবার ত্রিলোচনা এসেছেন এখানে। এখানে এই প্রদীপের মার কাছে। তাই মহামায়া তাঁকে প্রীতির চক্ষে দেখেন। তাঁকে আপনার বোনের মতোই ভাবেন। তাঁর সুখে তিনি সুখী হন। তাঁর দুঃখে তিনি দুঃখ পান।

মহামায়া বললেন, খবর সব ভালো তো?

—ভালো হলেই তো ভালো হত কিন্তু তেমন খবর আনতে পারিনি দিদি।

—কেন বলো দেখি ভাই? উৎকণ্ঠিত হলেন মহামায়া। আর ত্রিলোচনা বলতে লাগলেন, দু'দিন থেকে মেয়েটা ভারী ভুগছে জ্বরে। রাত্রি হলে গা বেশ গরম হচ্ছে······

—তাই নাকি? গৌরীর অসুখ?

মহামায়াকে বেশ চঞ্চল হতে দেখা গেল।

—আর শুধু অসুখ নয়, তার সঙ্গে আর এক উপলক্ষ এসে উপস্থিত হয়েছে, জ্বর বেশী উঠলেই মেয়েটা ভুল বকছে···

—তাই নাকি ? বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল মহামায়ার চোখ : কী ভুল বকছে ?

—ভুল বকছে মানে প্রদীপের শুধু নাম করছে। বলছে প্রদীপদা…প্রদীপদা…

ত্রিলোচনা একটু থামলেন। ফের সুরু করলেন, আপনি কী প্রদীপকে কিছু বলেছেন দিদি ?

—কী বলবো ভাই ?

ত্রিলোচনা কথা বললেন না কিন্তু সন্দেহটা কোথায়—সহজেই বুঝে নিলেন মহামায়া। একটু মৃদু হাসলেন : এ যুগটাই অন্য রকম দেখছি। কলির আয়ুও যেমন অল্প, আয়াসও তেমনি অস্থির ! এসব হল কী ! এইটুকু বয়সেই এত বাড়াবাড়ি—আমরা তো কখনো বাবার জন্মে দেখিনি ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, প্রদীপ বাড়ি এলেই তাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রদীপ গেলেই সব অসুখ সেরে যাবে দেখবে।

—হ্যাঁ দিদি, তাই একটু করুন।

ত্রিলোচনা কম্পিত হস্তে মহামায়ার সুশ্রী দুখানি করপুট স্পর্শ করলেন।

মহামায়া বলতে লাগলেন, প্রদীপকে তুমি খুব ভলোবাসো জানি। অদৃষ্ট যদি প্রসন্ন হয়, প্রার্থিত বস্তু নিশ্চয় পাবে। তাতে সন্দেহ কেন করো ভাই ?

—কী জানেন দিদি ? ত্রিলোচনা সুরু করলেন—বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার কল্পনা করাও পাপ। সে-সৌভাগ্য

কী আমার হবে? সত্যিই কী আপনার মতো দিদি জীবনে আমার জুটবে? ভাবতেও যে ভয় করে! কী আছে আমার! কী আছে আমাদের! সম্বন্ধের পরিচয় বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে সম্পর্ক কৈ? আপনি রাজী হলেই যদি রাজা রাজী হন তবে না জানি আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে!

—আজই তো তার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে না ভাই। সাধনা করলে কী না হয়? স্থিরো ভব। এই, সময়ই একদিন সুসময় আনে।

—আর দুঃসময়ও তো আনতে পারে!

—তা যদি আনেই সে তবু তাঁরই দান। সে হল তাঁরই দৌরাত্ম্য! তোমার-আমার হাত কৈ?

—কিন্তু অপরাধের মধ্যে আমি যে হচ্ছি মেয়ের মা! মেয়ের মা হওয়ার কতো যন্ত্রণা—আপনি কী তা বুঝতে পারবেন দিদি?

—ছেলের মা হওয়ার কষ্টও তুমি বুঝবে না ভাই। এক কাজ করো। তুমি একটু দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে না হয় যাই। গৌরী কী একা তোমার-ই মেয়ে? পেটে ধরিনি বলে কি তার ওপর আমার অধিকার থাকবে না? সে-দিদি আমাকে পাবে না তুমি।

মহামায়া কক্ষান্তর থেকে ঘুরে এসে বললেন—চলো।

এদিকে শিশু চিত্তের একটা বোঝাপড়ার পালা চলছিল।

প্রদীপ বললে, রাগ হবে না আমার? হবে না কেন শুনি?

আমি কোথায় কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, বাবার বকুনি খেয়েও লুকিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম, কতো কথা কতো গল্প বলবো বলে—আর তোর আক্কেলটা কি শুনি? তুই যে বড় পালিয়ে রইলি?

—তা আমাকে কী মানা করে গেছলে কোথাও যেতে? আর তুমি যদি কলকাতা ঘুরে আসতে পারো, আমিই বা কোথাও যাবো না কেন শুনি দুদিনের জন্যে? আমার বুঝি যেতে ইচ্ছা করে না?

—না, করে না। তুই মেয়েছেলে আর আমি বেটাছেলে—এটা বুঝিস না কেন? বেটাছেলে সব জায়গায় যায়, মেয়েছেলে শুধু ঘরে বসে বসে তার অপেক্ষা করে। বুঝলি?

—বা-রে! আমি বুঝি তোমার বৌ, যে এতটা জোর ফলাতে আসছো আমার ওপর?

—বেশ, তুই যদি আমার বৌ নোস, এ মহাদেবও পাবিনা। দুর্গাকে দিয়ে চলে যাই—কেমন তো?

মহাদেবটিকে একবার করে ঝুলির ভিতর থেকে বার করতে লাগলো প্রদীপ আর ফের পুরে রাখতে লাগলো।

গৌরীর চোখে এল জল। জ্বর ভোগ করা দুদিনের শুষ্ক চোখ জলে সজল হয়ে উঠলো। গৌরী বলতে লাগলো—কতোদিন তোমার খোঁজ করেছি, দরজার সামনে সমানে বসে-বসে তোমার অপেক্ষা করেছি, রামকে দিয়ে খবর নিয়েছি, তোমার হাত ধরতে গেছি। তুমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়েছো! এখন

ওই মহাদেব ওকে দেবে না তো আর কাকে দেবে বলো ? দুর্গারই মহাদেব মাঠের ওপর ফেলে ভেঙ্গে দিয়েছিলে কিনা ! বেশ তো, দুর্গাকেই দিয়ো. আমার চাই না।

অভিমানভরে গৌরী—প্রদীপের দিকে পিছন ফিরলো।

প্রদীপের এবার সত্যই দয়া হল। স্কুল থেকে আসবার পথে গৌরীকে প্রত্যাখ্যান করার পর থেকেই প্রদীপের খুব কষ্ট হচ্ছিল।

ভাবছিল—কেন সে এমন করলো ? গৌরী কী খুব দোষ করেছে ? অনেক বুঝে, চিন্তা করে সে আর ·স্থির থাকতে পারলো না। তারপর, আজ সকালেই যখন সে দুর্গার মুখ থেকে শুনলো, গৌরী পীড়িত, গৌরী ভুল বকছে, তার নাম করে চেঁচিয়ে উঠছে রাত্রে, তখনই তার কোমল মন ভেঙ্গে পড়েছিল। তারপর স্কুলে গিয়েই শুনলো, অমুক লোক্ মরে যাওয়াতে আজ স্কুলের হাফ্ হলিডে। তখনই সে মনস্থির করে বসলো—আজ দুপুরেই মহাদেবটিকে নিয়ে গৌরীকে দেখতে যাবে।

এক ফাঁকে করলোও তাই। বাড়ীতে এল। আর সকলের অগোচরে সে বেরিয়ে পড়লো ঝুলির ভিতর মহাদেবটিকে পুরে।

অবশেষে প্রদীপ রণে ভঙ্গ দিল। সুর ধরলো আপোষের। অবিমিশ্র আলাপের।

—দূর ! তুইও যেমন ! আমি দুর্গাকে দেব বলতেই তুই বিশ্বাস করলি ? দুর্গাকে দিতে যাবো কী দুঃখে ? মেলা

দেখাতে দুর্গাকে নিয়ে গেছলাম—না, তোকে? আর রাগ করতে হবে না, এই নে তোর মহাদেব।

প্রদীপ প্রসন্নমনে মহাদেবটিকে তুলে দিল গৌরীর করপল্লবে। গৌরী সেটি পেয়ে এবার পিছন ফিরে থাকতে পারলো না অভিমান ভুলে সামনে ফিরলো। মুখোমুখি হল প্রদীপের। প্রদীপের মুখের দিকে সে মুখ করলো। মুখ ফেরালো।

গৌরী বললে, আর তোমায় না বলে কোথাও যাবো না, তাহলেই খুশি তো তুমি?

—হ্যাঁ, তাহলেই খুশি।

গৌরী স্বচ্ছন্দ চিত্তে তার একটা দুর্বল, অসুস্থ হাত রাখলো প্রদীপের কোলে।

—এর পর আরো তোমার কথা বলো, তোমার যত গল্প। কতো দিন বাদে তোমায় কাছে পেলাম বলো তো প্রদীপদা?

এসব বলে কী এইটুকু মেয়ে!

মহামায়া গালে হাত দিলেন।—কলি শেষ হয়ে এল নাকি? দেখে দেখে তিনি বোধহয় আর স্থির থাকতে পারেন নি। তাই এই মন্তব্য বেরুল তাঁর মুখ দিয়ে। আর লজ্জার যেন একটা চমৎকার চাবুক এসে পড়লো, গৌরীর নয়—গৌরীরই গর্ভধারিণীর মুখে!

—এসব কী ভুল বকছিস তুই? ত্রিলোচনা আর্তনাদ করে উঠলেন।

আর বাধা দিলেন তাঁকে মহামায়া—তুমি চুপ করো দেখি ভাই। ওরা একটু নিরিবিলিতে কথা বলছে তাতেও তুমি বাদ সাধতে চাও? এই না তুমি প্রদীপকে খুঁজতে গেছলে?

নিরিবিলির স্থির সরোবর তখন অস্থির হয়ে উঠেছে। সরোবরে সোরগোল জেগেছে। গভীর রাত্রে যেন জেলেরা ফেলেছে জাল। লণ্ঠনের আলোয় আর কোলাহলে অন্ধকার অপ্রস্তুত হয়ে উঠেছে।

প্রদীপও কম লজ্জিত হয় নি। মার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে উঠলো।

—তুমি এখানে কেন মা ?

—তোকে যে খুঁজতে এলাম আমি। তারপর, গৌরী মা, জ্বর ছেড়েছে এখন? মহামায়া এগিয়ে গেলেন। নেপথ্য থেকে নৈকট্যে এলেন। গৌরীর কপালে হাত রাখলেন তিনি।

—না, গা এখন ঠাণ্ডা!

ত্রিলোচনা একখানা মাদুর পেতে দিলেন। মহামায়াকে বললেন, বসুন।

মহামায়া না বসে বাইরে এলেন। বললেন, প্রদীপ এখন পড়ছে। যে কোনো প্রকারে ওকে পাশ করতেই হবে, মানুষ হতে হবে। সেটা তোমারও যেমন ইচ্ছা, আমারও তেমনি অভিলাষ। আমি তাই ভাবছি······

—কী ভাবছেন, আর জিজ্ঞেস করবার সাহস হল না ত্রিলোচনার। একটা কম্পিত, ভীরু চাহনির ভিতর দিয়ে

ত্রিলোচনা আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেন। আর মহামায়া আগের সুরই টেনে গেলেন, আমি তাই ভাবছি, এই বয়সে এদের এত বাড়াবাড়ি যাতে না হয়, সেটা তোমারই দেখা উচিত।

একটু থেমে কথাটাকে আরো পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন তিনি।

—মানে, ছেলে-মেয়েদের এই বয়সটা বয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। এত ঢলাঢলির মধ্যে ঢোলে না পড়ে মানুষ হওয়ায় যাতে মতিগতি আসে সেইটেই আমাদের দেখা উচিত। আমি দেখবো ছেলের পক্ষ, তুমি দেখবে মেয়ের। উপস্থিত তো বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়! এখানে পয়সার প্রশ্ন নয়, মানুষ হওয়ার মর্যাদা! আমার ছেলেটি যদি মুখ্যু হয়, তুমি তাকে জামাই করবে?

ত্রিলোচনা এত কথা ভাবেন নি! এত তলিয়ে ভাববার তাঁর অবকাশ হয়নি, তবু মহামায়ার কথার সুরটা কেমন যেন তাঁর কানে আজ কঠিন, তিক্ত মনে হল। তিনি যে কী বলবেন —ভেবেই পেলেন না।

কিন্তু যাবার আগে মহামায়া সব কাঁটাই তুলে দিয়ে চলে গেলেন। সব কুজ্মটিকাই সরিয়ে দিয়ে সরে গেলেন। বললেন, দুঃখ কোরো না ভাই। আমি যদি বেঁচে থাকি, নিশ্চয় গৌরীর সঙ্গেই আমার প্রদীপের বিয়ে দেব। গৌরীকেই আমার বৌ করবো। কিন্তু তার আগে তোমাকেও একটি কাজ করতে হবে। তোমাকে দেখতে হবে, তোমাকে আশীর্বাদ করতে হবে, প্রদীপ যেন পাশ করে। প্রদীপ যেন মানুষ হয়।

দিন যায় না দিন যায়! বছর যায় না জল যায়!

জলকেও হয় তো জব্দ করা চলে কিন্তু সময়ের স্রোত অপ্রতিহত, অপ্রতিরুদ্ধ। এক বছর নয়, একাধিক বছর, একদিন নয়—শত শত দিন এর পর কেটে গেল। ঝড়ে পড়লো কতো বাড়ি, বর্ষায় জাগলো কতো গাছ, বাদলে জাগলো কতো আগাছা! মর্মরে জাগলো কতো মাদল, কতো মহুয়া! কেউ ঘট ভেঙ্গে দিয়ে গেল, কেউ ঘট ভরলো। কেউ দিল, কেউ নিল। কেউ হারালো, কেউ পেল। এই হচ্ছে জীবন আর এই হচ্ছে জীবনের প্রগতি! জীবনের আদিম রহস্য উন্মোচন! মহাকালের চাঁদার খাতায় একটু একটু করে ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা দাও—তোমার দেহের, তোমার প্রাণের স্বতঃস্বেচ্ছ কণিকা। তারপর যখন নিঃশেষ হবে, যখন রিক্তবিত্ত হবে, মহাকালই তুলে নেবে তোমায় তার বিজয়রথে। পরিবর্তনশীল জগৎ! ধীরে ধীরে—শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্তন আসছে। পরিবর্তন আসছে মেঘে-মেঘে, পরিবর্তন আসছে আকাশে-বাতাসে, পরিবর্তন আসছে নিরত্যয় অন্তরীক্ষে। নিসর্গজ নিরঙ্গতায়!

এরই মধ্যে সন্দীপের একদিন বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে সে নিজে থেকে করলো না, বিয়ে দিলেন বীরেন্দ্রকিশোর। বেশী না, পেলেন মাত্র সাত হাজার। সাত হাজারে তাঁর মতো লোকের মন ওঠা মর্মান্তিক! শোধ তুলবেন এর প্রদীপের বেলায়—বলে রাখলেন। কিন্তু যে সাত পাক ঘুরে এল, তার মন উঠলো। সন্দীপ পেল সুশ্রী আচলের সুস্নিগ্ধ আশ্রয় আর

প্রদীপ পেল একটি স্নেহময়ী রমণীর সুধানিষ্যান্দ আশ্বাস। সন্দীপ পেল বৌ, প্রদীপ পেল বৌদি। সন্দীপ পেল চাঁদ, প্রদীপ পেল চন্দ্রিকা। কিন্তু কথার এইখানেই শেষ নয়।

মহামায়া যে একদিন ত্রিলোচনাকে বলে এসেছিলেন, তোমাকে দেখতে হবে, তোমাকে আশীর্বাদ করতে হবে প্রদীপ যেন পাশ করে—প্রদীপ যেন মানুষ হয়, তা—ত্রিলোচনা কী দেখেছিলেন ? মানুষ কে কাকে দেখতে পারে ? কে কাকে দেখে ? দেখারই বা মূল্য কি ? দেখলেই বা পুরস্কার কৈ ? গাল দাও—তিরস্কার আছে। আশীর্বাদ করো—পুরস্কার নেই! ত্রিলোচনা দেখেছিলেন কিনা জানি না, আশীর্বাদ করেছিলেন কিনা—সে খবরও অজ্ঞাত, তবু পাশ করা অর্থ যদি মানুষ হওয়াই হয় তা হলে কী বলবো? প্রদীপ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছে। আর শুধু পাশ নয়, পেয়েছে বৃত্তি। পেয়েছে নিস্তরণ। কিন্তু এখন ?

এখন সে কলকাতার কলেজে গিয়ে পড়বে। থাকবে হোস্টেলে। আর তার কী চাই ? কিন্তু চাওয়ারই বা শেষ কৈ ? চাইলেই বা দিচ্ছে কে ? যা চাওয়া যায় তাই কি পাওয়া যায় ? যা চাওয়া যায় তাই কী সবাই চেয়েছিল ? যা পেয়েছিল তাই কী কেউ রাখতে পেরেছে ?

পরিবর্তনশীল জগৎ! পরিবর্তন আসছে মেঘে মেঘে, পরিবর্তন আসছে আকাশে-বাতাসে আর পরিবর্তন আসছে তন্বীর তনুদেহেও বৈকি! দু’ বছর আগের গৌরী আর আজকের

গৌরীতে কতো তফাৎ, কতো বৈচিত্র্য, কতো ব্যতিক্রম। যে ছিল বিশীর্ণ উপবন, আজ তাই বিস্তৃত উপত্যকা। যে ছিল ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী, আজ তাই স্ফীতদেহা গঙ্গা! যে ছিল দু'বছর আগে, ছন্দছুট বালিকা, আজ সে-ই দু'বছর পরে অনন্যা যুবতী! যে ছিল—শুধু বলতে পারো ফর্সা, সে শুধু ফর্সা নয়, সে আজ অতিবড় সুন্দরী। রূপ যেন তার ভাদ্রের ভরা নদীকেও হার মানালো। দেহ নয়—মেধ নয়—বুক নয়, সমস্ত মিলিয়ে গৌরী যেন একটা সাবলীল বিদ্যুৎ-শিখা! যেন গরিব গৃহস্থ ঘরের বালিয়াড়িতে সে একটা বীতনিদ্র বিস্ময়! যেন প্রলয়ের পরমুহূর্তে সে একটা জাগ্রত পট-পরিবর্তন! আর সেই গৌরীর কাছেই আসতে হল বিদায় নিতে প্রদীপকে—কলকাতা যাবার প্রাক্কালে।

প্রদীপ একটা নিক্ষিপ্ত বলের মতো হুড়-মুড় করে ঢুকে পড়লো। ঢুকে পড়লো ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই যখন উমাশংকর বেরুচ্ছেন পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ সারতে।

উমাশংকরকে সামনে পেয়েই প্রদীপ তাঁর পদধূলি নিল।

—জানেন কাকাবাবু, আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছি। আজ খবর এসেছে। বৃত্তি পেয়েই পাশ করেছি আপনাদের আশীর্বাদে।

—তাই নাকি?

প্রথম ঝোঁকটা কাটিয়ে নিতে বেশ তাঁর দেরি হল। উমাশংকর চাইলেন প্রদীপের পানে। প্রদীপের বয়স বাড়েনি

বেশি। কিন্তু দৈর্ঘ্যে তার দীনতা নেই। আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে প্রদীপ দাঁড়াক। তারা ম্লান হবে—ডুবে যাবে কিন্তু প্রদীপ ডুববে না। আকাশে অসংখ্য তারা কিন্তু চাঁদ মাত্র একটি। পৃথিবীতে অসংখ্য বাতি কিন্তু প্রদীপ সেখানে প্রদীপই। সে-ঔজ্জ্বল্য, সে-আকর্ষণী শক্তির প্রস্তুতিতে নিশ্চয়ই পশ্চাদপদ নয় প্রদীপ, যে শক্তি উদ্বুদ্ধ করে—উৎসাহ ঘটায় জনতার, তার দিকে ফিরে চাইবার।

উমাশংকর আশীর্বাদ করলেন, বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো। তারপর···এখন কী করা হবে?

—কলকাতা যাবো······পড়বো কাকাবাবু।

—বেশ বেশ। বড় সুখী হলাম, বড় সুখী হলাম, মাঝে-মাঝে আসবে তো?

—আসবো বৈকি কাকাবাবু, আসবো না আবার?

উমাশংকর আর দাঁড়াতে পারলেন না। দু'তিন বাড়িতে সত্যনারায়ণ সারতে হবে। বললেন, ভিতরে যাও বাবা, বসো গিয়ে······ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন ··এসে সব শুনবো।

উমাশংকর পা চালিয়ে চলে গেলেন। আর প্রদীপ ঢুকে দেখলো, গৌরী বসে কুটনো কুটছে। দুধে-আলতায় গোলা তার রঙ। গাল দিয়ে আভা বেরুচ্ছে নটকানের। দু'কানে দুটি দুল। পরণে তাঁতের একখানি শাড়ী। অবশ্য রঙিন। আর মাথায়? মাথায় চুল নয়, আঙুর দোলানো অলকগুচ্ছ। দু'খানি চুড়িপরা হাত। নখমুকুরে নিস্তন্দ্র উদ্ভাস। সুডোল, সুগোল

হাত দিয়ে সে কুটনো কুটছে। আর কুটনো কোটার দৃশ্যও যে এত সুন্দর তা এই প্রথম অনুভব করলো, প্রথম উপভোগ করলো প্রদীপ।

প্রদীপ হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বললে, জানো গৌরী, আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছি, আজই খবর পেলাম। সেই খবর তোমাকে দিতে এলাম।

—ম্যাট্রিক পাশ করার খবরে আর বাহাদুরী কী আছে?

প্রথমটায় ঝলমল করতে গেল গৌরী। পরে গুটিয়ে গেল। শীতের শম্বুক! বললে, ম্যাট্রিক পাশ তো অনেকেই করে। অনেকে যা না করে তাই বলো।

—তাই নাকি? তুমি কি ভাবছো, আমি শুধু পাশই করেছি, বৃত্তি পাইনি?

—আচ্ছা. আচ্ছা···হয়েছে! আমি শুনেছি, আগেই শুনেছি, যখন তুমি বাবাকে বলছিলে। শুনে খুবই খুশি হয়েছি। এখন চলো—বসবে চলো ওঘরে।

কুরঙ্গিণীর মতো গতিতে আনলো ক্ষিপ্রতা গৌরী। প্রদীপকে নিয়ে গিয়ে বসালো তাদের ভাঙা ঘরে, ভাঙ্গা তক্তাপোষে। ভাঙা তক্তাপোষের তিন পা মৌলিক, এক পা কৃত্রিম। ইট দিয়ে সেটি আটকানো। মাটির ঘর। দেওয়ালের গর্ত গতানুগতিক। গর্তে সাপ থাকে, না ইঁদুর—বলা শক্ত। একধারে গোটা পাঁচটা ছাতা, তিন জোড়া খড়ম, চার জোড়া চামড়ার চটি, সিঁদুর-চুপড়ি, নূতন বাসনের ভিড়! পূজা করতে গিয়ে উমাশংকর

এগুলি পেয়েছেন। তিল তিল করে রেখে এগুলি হয়েছে তাঁর তিলোত্তমা। আরো পাবেন, আরো হবে। শ্রাদ্ধে যজ্ঞেশ্বরের কাপড় চাই। কাপড় না পারো, গামছা দাও। গামছা এসেছে ঘরে একরাশ। মধু নেই, গুড় দাও। মধু আসেনি, গুড় এসেছে। সন্দেশ নেই, গুঁজিয়া দাও। গুঁজিয়া নেই, বাতাসা দাও। বাতাসা আছে, আমসত্ত্ব আছে, নারকেল নাড়ু আছে। কী নেই?

—দাঁড়াও, তোমায় নারকেল নাড়ু দিয়ে জল দিই।

ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল গৌরী ঘর থেকে। চেপে ধরলো তার হাত প্রদীপ: দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হোয়ো না। কাকীমা কোথায়?

—কাকীমা নেই। হাত ছাড়ো—পরে বলছি।

হাত ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গেল গৌরী রান্না ঘরে। পিছন পিছন প্রদীপও···

—একি, প্রদীপদা! তুমি এখানে এলে যে বড়?

—কত খিদে নিয়ে তোমার কাছে এলাম, কতো বড় সুখবর আনলাম, তাতেও নারকেল নাড়ু? অন্য কিছু দেবে না?

—খাবে? খাও না! গৌরী ভারী খুশি হল।—তা বললেই তো পারো। আচ্ছা, ঘরে গিয়ে একটু বোসো, কেমন? এখনি আমি ব্যবস্থা করছি!

কী ব্যবস্থা গৌরী করে—না দেখে পারলো না প্রদীপ। ঘরে গিয়েই বসলো। আর দশ মিনিটের ভিতর গোটা ছয়েক লুচি আর আলু ভেজে থালায় করে নিয়ে গিয়ে হাজির হল গৌরী। থালায় এক গেলাস জলও ছিল।

এত যত্নের খাবার দেখে প্রদীপ আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। থালা তখনো গৌরীরই হাতে। প্রদীপ বললে, জানো গৌরী, কালই আমাকে কলকাতা চলে যেতে হবে, বাবার হুকুম হয়েছে, যেন ঘন-ঘন গ্রামে না আসি!

গৌরীর হাত থেকে থালাটা মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়লো মাটিতে —মায় জলের গেলাস!

কথাটা বলার পর যে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, আগে তা ভাবেনি প্রদীপ ঘুনাক্ষরে। আর যতো না লজ্জিত হল গৌরী, যতো না ক্ষুব্ধ হল গৌরী, তার বেশী অপরাধী ভাবলো—অজ্ঞ ভাবলো আপনাকে প্রদীপ।

সামলে নিল গৌরী সহজেই। ম্লান হেসে খানিকটা চাইলো সে প্রদীপের মুখের দিকে। বললে, এই সুখবরটা দেবার জন্যেই কী আজকের সন্ধ্যায় এলে তুমি প্রদীপদা? জানি তুমি বড় লোক, আমাদের দেওয়া খাবার তোমার মুখে রুচবে না,—তাই কী করতে এলে পরিহাস?

প্রদীপও নিজের ভুল সম্বন্ধে ততক্ষণে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এক চোখে হাসি, অন্য চোখে অশ্রু ফুটিয়ে বললে, গৌরী, তুমি কী পাগল হয়ে গেলে? আমার বাবার শুধু হুকুমই শুনলে আর আমার কথা কী কিছুই তোমার শোনবার ছিল না?

—তা আর বললে কৈ প্রদীপদা? তুমি তো কলকাতা চলে যাবে কালই কিন্তু আমার কী হবে, আমি কি করবো, সে—তো কিছুই বললে না?

গৌরীর চোখে দেখা দিল অবসাদের অশ্রু।

প্রদীপ বললে, বলবার দিন এখনো ফুরোয়নি। কলকাতায় গিয়ে সত্যিই যদি তোমায় ভুলে যেতে পারি, তখন বলো। কিন্তু তার আগে কিছু আমার খাওয়া দরকার। আমি ক্ষুধার্ত। তোমার যত্নের দান মাটিতে ফেলে মাটি হতে আমি দেব না।

পরিত্যক্ত খাবারগুলি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কুড়িয়ে নিলো প্রদীপ। আর নিবিড় একটি নারীত্ববোধের তরঙ্গ জেগে উঠলো গৌরীর অন্তর-অলকানন্দায়।

গৌরী বাধা দিল, ওগুলো থাক্, আমি আবার করে আনছি।

তাকে বাধা দিতে গিয়ে ছোটখাটো একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি হল। আর যে হাতে প্রদীপ খেতে গেল সেই হাতেই সে দেখলো রক্ত। একখানি লুচির এক কোণে এরই মধ্যে লেগে গেছে চাপ, জমাটবাঁধা খানিকটা রক্ত! যে রক্ত মানুষের জীবন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে জোঝবার যুগপৎ যোজনা।

—একি? রক্ত কোথা থেকে এল? প্রদীপ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকালো।

—রক্ত আমার হাত থেকে বেরুচ্ছে। তোমার জন্যে আলু কাটতে গিয়ে হাত কেটেছি!

—উঃ, কী সর্বনাশ করলাম বলো তো! কী কুক্ষণেই যে এলাম! দেখি দেখি কতখানি কেটেছ!

প্রদীপ অস্থির, চঞ্চল হয়ে গৌরীর ক্ষতস্থান দেখতে গেল;

আর তীব্র ভাবে বাধা দিল তাকে গৌরী। বললে, থাক্ দেখতে হবে না। আমি নিজে থেকেই কেটেছি। সোজা হয়ে দাঁড়াও।

—এসব তুমি কী বলছো গৌরী ?

প্রদীপ যেন আরো বিস্মিত হল।—নিজে থেকে কেউ হাত কাটে ?

—কাটে। গৌরী বললে, তোমার এই জয়ে আমি যদি কিছু ক্ষয় না করতে পারলাম, কিছু না খরচ করলাম তবে আমার আনন্দ কৈ ? আমার কি আছে ? আমি তোমায় কী দেবো ? তাই এই সামান্য রক্তপাত করে তোমার কপালে অসামান্য রক্ততিলক এঁকে দিই—এসো! এই হবে তোমার বিজয়ের অভিধায় আমার সাগ্রহ অভিনন্দন। আমার সমুদ্ধত সমর্থন।

গৌরী অনম্য অঙ্গুলি তুলে প্রদীপের কপালে পরালো রক্ত-তিলক! আর সহসা মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি সুরু হয়ে গেল।

—এ কিসের শাঁক ? প্রদীপ প্রশ্ন করলো বিহ্বলের মতো।

—এ আশীর্বাদের শঙ্খধ্বনি। জবাব দিল গৌরী।

—আশীর্বাদ ? কার ?

—তোমার বলে কী মনে হয় ?

রসিকতা না করে পারলো না গৌরী।

—আমার আশীর্বাদেও শাঁক লাগবে ?

প্রদীপও জিততে চায়।

—দুর্গার আশীর্বাদ হয়ে গেল পাশের বাড়িতে।

বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন ত্রিলোচনা। ত্রিলোচনাকে যেতে হয়েছিল দুর্গার আশীর্বাদে !

আর প্রদীপ যখন বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এল ঐ গৌরীদেরই বাড়ি থেকে, তখন আর সে উদ্দীপ্ত বল নয়। উত্তেজনাহীন, ক্ষয়িষ্ণু একটা গুলী। বন্দুকের। যে গুলী দিনান্তের নিশান্তের সমস্ত প্রহর ধরে জনহীন ভূখণ্ডে তুষারে আর বরফে ভিজে ভিজে অসাড় হয়ে গেছে। আবর্জনা হয়েছে, আবর্জিত মৃত সৈনিকদের পাশেই পড়ে থেকে থেকে।

নয়

দুর্গার বিয়ে হয়ে গেল। আর আটদিনের মাথাতেই সে এল বাপের বাড়ী। বিয়ের পর আর সে কুমারী নয়। সে তখন সধবা। সবাকার নয়—কেবল একজনের। গোপনচারিণী নয়, স্বামীরই স্বপনচারিণী! আর তাকে তখন দেখে কে! ছিল প্রতিমা, পেল প্রাণ! ফুল হয়ে ফুটলো, ফল হয়ে উঠলো। আর তাকে দেখতে এল পাড়া প্রতিবেশী-মেয়েরা। কী-কী গয়না শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে সে পেল, কী নিয়ে গেছলো, কী নিয়ে এল— সব তারা দেখলো। খুঁটিয়ে খোঁজ নিল। চুটিয়ে চাটলো।— সব খবর। সব খাবার। আর এই একটি কালো মেয়েই আলো করলো তার বাপ-মার অন্তঃকরণ! মাথার টিকলি আর কানের পাশা ঝুমকোয়, গলার নেকলেস আর কোটকির পেনডেণ্টে, হাতের ময়ুর-আর্মলেট আর বিদ্যুৎ-চুড়ির বহ্নিশিখায়, আঙুরলতা চূড় আর হাঙরমুখো কঙ্কনে, মটরবালা আর দার্জিলিং পাথরের আংটিতে, কাতান বেনারসী আর কাঁপানো কণ্ঠস্বরে সে শুধু বাড়িটাকেই মসগুল করলো না, পার্টিসানের ওপাসটাকেও পোষ মানালো।

ত্রিলোচনা দেখতে এসেছিলেন দুর্গাকে। জামাই দেখে সহসা মাথায় কাপড় তুললেন। হাঁ হাঁ করে উঠলেন দুর্গার মা: ওকি! ও-যে তোমার ছেলে! ওকে দেখে মাথায় কাপড় দেবে কি, আশীর্বাদ করো।

আশীর্বাদ করতে গেলেও এবাজারে খাজনা দিতে হয়। মুখের চেয়েও যে মনিব্যাগ বড় আর ধান দুর্বার চেয়েও যে ধন-ঐশ্বর্যের কদর বেশী, এ এখন কে-না বোঝে ?

কিন্তু প্রণাম করলে তবে তো আশীর্বাদ! না, শুকনো প্রণামের আগেই প্রণামী দিতে হবে প্রীতিভাজনকে ? এঠিক না বুঝে—ত্রিলোচনা একটি টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করে এসেছিলেন জামাইকে। জামাইয়ের নাম রণজিৎ। রণজিৎ কিন্তু প্রণাম করেনি। কেন করেনি, গরিব বলে না অন্য কারণে—সে খবর আমরা জানি না। কিন্তু দুর্গার মা বলেছিলেন, আজকালকার ছেলে তো, ওরা আবার যাকে তাকে প্রণাম করে না !

ত্রিলোচনা ফিরে এসেছিলেন নিজের ঘরে।

দোষের মধ্যে গৌরী বলেছিল, কতো গয়না পেয়েছে বলো তো মা, দুর্গা।

সামান্য মাত্র কথা কিন্তু মায়ের প্রাণে এর প্রতিধ্বনি যে কতো কঠোর, কতো গভীর হয়ে বেজেছিল তা কী গৌরী বুঝতে পেরেছিল ? হয় তো কিছুটা পেরেছিল। তাই কথাটা ভুলিয়ে দেবার ছলেই, গুলিয়ে দেবার জন্যই পরক্ষণে বলেছিল, যাই বলো মা, দুর্গার বরটা—মোটেই কিন্তু ভালো হয়নি। যেমন মূর্তি তেমনি কীর্তি। যেমন কালো তেমনি রোগা, যেমন বেঁটে তেমনি বাচাল ! যেন দু'চক্ষের বিষ !

ত্রিলোচনা ভাবছিলেন অন্যকথা। গৌরী আর দুর্গা—দুদিনের মাত্র ছোট-বড়। দুর্গার বাবার পয়সা আছে, তাই

বরপক্ষ একবার দুর্গার রূপটাকে পর্যন্ত দেখলো না। দেখলো দৌলত, দেখলো দক্ষিণা। কিন্তু গৌরীর বাবার কী আছে? চালকলা-বাঁধা পুরোহিত! গতর থাকে—খাটো। মুখ থাকে —মন্ত্র আওড়াও। বুদ্ধি থাকে—পথ বাতলাও। নইলে ভরা ডুবি! ভরা ভাদ্রে ভরা ম্যালেরিয়া। পেট জোড়া পিলে-লিভার। সংস্থান বলতে কিছু নেই। একটা চাকরি-জীবীরও পরকাল আছে, পুরোমাত্রার দাবি আছে, পুরো সুখ পুরো স্বাচ্ছন্দ্য আছে কিন্তু পরহিতের জন্য যে পুরোদস্তুর পরম-ত্যাগী তার দাবি, ইহলোকেও যা—পরলোকেও তাই। নিরীহ লোকগুলোকে নিংড়ে নিংড়ে, ছেঁচে ছেঁচে রসগ্রহণ করে দুরুহ লোকগুলো। এদের লোভ এত প্রচণ্ড, এত প্রচুর, যে লুকিয়েও যদি কেউ নিরীহ হয়ে থাকবার সুযোগ পায় কোনো অন্ধকারে তবু এরা নুলো বাড়িয়ে-বাড়িয়ে তাদেরও অক্ষত থাকতে দেয় না। আর সেই দুর্দশাগ্রস্ত দুনিয়ায় দ্বাপর যুগের ব্রাহ্মণ্য দাপট কতোক্ষণ টিকবে? ত্রিলোচনা তো হাজার ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না কেমন করে গৌরীর বিয়ে হবে। কে তাকে বিয়ে করবে? প্রদীপের মতো অনেক ছেলের কথাই তিনি শুনেছেন আর গৌরীর মতো অনেক মেয়ের কথাই তিনি জানেন, যারা কতো অন্তরঙ্গ—অন্তহীন হয়ে শৈশব কাটিয়েছে। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দাম ঝড়ে কোথায় উড়ে গেছে, কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়েছে। কোথায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে! কে জানে—কি অদৃষ্টে আছে! কী অমোঘ বিধান নিয়ে ভাগ্যবিধাতা কৌতুক

করবেন! দরিদ্রের উপর ভাগ্যবিধাতার যৌতুকই হচ্ছে তো কঠিন কৌতুক! সেদিনও মহামায়া বলেছিলেন, ভেবো না বোন। আমি যদি বাঁচি প্রদীপের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে দেবই। কিন্তু তিনিই কী সব? তিনিই কী একা বিয়ে দেবার মালিক? এ-কথায় তো মন ওঠে না ত্রিলোচনার!

যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন ত্রিলোচনা। যেন মৃত্যু থেকে মুখর হয়ে বেঁচে উঠলেন ত্রিলোচনা। বললেন, হ্যাঁ, কি বলছিলি গৌরী?

গৌরী পুনরাবৃত্তি করলো কথাটার।—যাই বলো মা, দুর্গার বরটা মোটেই কিন্তু ভালো হয়নি!

—ভালো হয়নি তো তোর কী? যেন ক্ষেপে উঠলেন তিনি।—ওই বরই কী তোর জুটবে? বল না। এমন কোথাও হাতে তোর লেখা আছে?

গৌরী একেবারে চুপসে গেল। ঠাণ্ডা হয়ে গেল নির্ধূম চুল্লীর মতো। ছুটির দিনে, কারখানার চিমনীর মতো।

তাতে কিন্তু কিছুই আটকালো না দুর্গার! বিয়ের আগে যদি বা সে এবাড়িতে দু'একবার হাঁটা দিত, বিয়ের পর কিন্তু সে দু'একবার নয়—দু'চারবার হাঁটা সুরু করলো। এই গৌরীর কাছেই। যেন গৌরী না হলে তার আর চলে না। তার মনের কথা, তার প্রাণের কথা গৌরী না হলে আর কার কাছে বলবে? এতদিন তার যে মন ছিল, প্রাণ ছিল সে বোধ হয় থাকতে হয়—বলেই ছিল। কিন্তু এখন তার মনের মূল্য

নিশ্চয় বেড়েছে, প্রাণেরও নির্হারী প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মনের মানুষ আর প্রাণের প্রাণেশ্বর না হলে মেয়ে মানুষের মনপ্রাণের অর্থ কি? কিন্তু কোন জায়গায় ব্যথা—গৌরী না বুঝলেও গৌরীর মা বুঝলেন! তিনি মেয়েকে কিছু বললেন না—কিন্তু বললেন মেয়ের বাবাকে।

উমাশংকর বললেন, ব্যস্ত হয়ো না। সবুরে মেওয়া ফলে। দুটির বিয়ে যে এক সঙ্গে হলে ভালই হত, আমিও বুঝি। কিন্তু অদৃষ্টের ওপর তো হাত নেই! হয় তো এই মুহূর্তে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আর এক মুহূর্তে যে কতো আনন্দ হবে সে তুমি বলতে পারো?

—আর আনন্দে আমার দরকার নেই! কষ্টের জীবনে কষ্ট করতেই তো জন্ম হয়েছে, কষ্টই করে যাই। কিন্তু পষ্টাপষ্টি একটা কথাবার্তাই ভালো। দুর্গা যে অমন করে গৌরীর আঁচল ধরে-ধরে ঘুরবে, এ আমার দেখতে মোটেই ভালো লাগছে না। তুমি বারণ করো গৌরীকে—গৌরী যেন সাবধান হয়।

—গৌরী কী দোষ করেছে যে বারণ করবো? আর দুর্গাই বা কী অন্যায় করেছে—তাও তো বুঝি না। দুটিতে বরাবর খেলা করেছে, মানুষ হয়েছে। আজ না হয় তার বিয়ে হয়ে গেছে, তাই বলে সে পর করে দেবে গৌরীকে? আসবে না আগের মতো? আর আসবেই বা সে কদিন? ফের তো ওর বর এসে ওকে নিয়ে চলে যাবে, তখন? তখন গৌরীই তো তোমার সবে ধন নীলমণি!

—তাই বটে! ভ্রূকুটি করলেন ত্রিলোচনা।—ওই বুদ্ধি নিয়েই তুমি সংসার করবে!

—সংসার আর আমি করছি কোথা? উমাশংকর হাসলেন। —সংসার তো চুটিয়ে তুমিই করছো! তুমিই তো দেখাচ্ছো, সংসার করা কাকে বলে!

দশ

কিন্তু যে যাকে যাই দেখাক. দুর্গার অনেক কিছুই হয়তো দেখানো এখনো বাকী ছিল গৌরীকে। তাই একদিন গৌরীর নিমন্ত্রণ হল দুর্গাদের বাড়ি। আর সে নিমন্ত্রণ ঠেলবার মতো ক্ষমতা—না রইলো গৌরীর, না তার মার!

অনেক রাত্রে খাওয়ার পাট চুকবে। তাই দুর্গা আগেই তার মার কাছে বায়না নিল, মা, গৌরী আজ আমাদের বাড়ি থাকুক, ও তো আর পর নয় আমাদের, তুমি গিয়ে একবার কাকীমাকে বলে এসো।

—তা, থাকে থাকুক না। কাকীমাকে আবার গিয়ে—বলে আসতে হবে? এখান থেকে হেঁকে বললে হবে না?

অতএব—গৌরী রাত্রে দুর্গাদের বাড়িই থেকে গেল। আর দুর্গা যতো না দেখালো, দুর্গার মা দেখালেন তাকে দশগুণ। বৌভাতে দুর্গা কী-কী পেয়েছে, সব—সব তিনি দেখালেন। দেখালেন পাঁচটা কাসকেট, নানা রকমের সিঁদুরকৌটো, একটা হিটার, দুটো নকল মুক্তার মালা, পঁচিশখানা বই, আরো কতো কী যে, তার শেষ নেই।

বলা বাহুল্য, খেতে বসে গৌরীর গলা দিয়ে যে কী কষ্টে ভাত নামলো, সেই জানলো। কিন্তু দুর্গা তাকে তখনি বেশি দুঃখিত হতে দিল না।

খাওয়া হয়ে যেতেই টেনে আনলো তাকে তার নিজের শোবার ঘরে। দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। বললে, এই ঘরে আজ তুই আর আমি ছাড়া কেউ থাকবো না, বুঝেছিস্? এখন বল দেখি তোর সব কথা।...শুনি।

—আমার আবার কী কথা আছে? বিষণ্ণ মনে উচ্চারণ করলো তার উক্তি—গৌরী।

—মা বুঝি তোর মনটা খারাপ করে দিয়েছে? মা অমনই!

দুর্গা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলো গৌরীকে তার নক্তনধর বুকের উপর।

—তোকে কী শুধু-শুধু আমি আজ ডেকে এনেছি গৌরী? তোকে আমি কতো ভালবাসি, তুই জানিস না রে। সত্যি, আমার না হয়ে তোর যদি আজ আগে বিয়ে হত, আমি কী কম খুশি হতাম? কিন্তু শুধু বিয়ে হলেই তো হয় না। বরগুলো কতো বদমাস্ সে তো তুই জানিস না। শুনবি তো বল্।

অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে বরের দৌরাত্ম্য শুনতে কার না ইচ্ছা হয়? হঠাৎ কেমন খেয়াল হল গৌরীর, সব শুনতে। আর সে রাজী হল।

—হ্যাঁ, শুনবো।

—শুনবি তো বিছানায় আয়।

বিছানায় নিয়ে গিয়ে বসালো দুর্গা—গৌরীকে। সাদা ধপধপে বিছানা। পুরু, দুধের মতো সাদা। যে বিছানার মাথার বালিসে এখনো লেগে আছে রণজিতের ঘাড়ের গন্ধ।

মানুষটা কালো হোক কিন্তু বড় সৌখীন! ঘাড়ের গন্ধ, কী ঘামের—কে জানে! তবু গন্ধটা বড় মিষ্টি, একটু ইভিনিং প্যারিসের আমেজ মাখানো। আর গন্ধটা এখনো উবে যাবার সময় পায়নি। গতকাল রাত্রেও রণজিৎ শুয়েছিলো এই বিছানায়। এই বালিসে মাথা রেখে। পাশে নিয়ে দুর্গাকে! রণজিৎ আজ সকালে উঠেই চলে গেছে, ফের হয়তো আসবে সপ্তাহখানেক পরে। এখন তার আসা-যাওয়ারই পালা। কিন্তু রণজিৎ চলে গেলেও তার গায়ের গন্ধ সে রেখে গেছে অকুণ্ঠ হয়ে। তীর্থস্থানে মানুষ আসে, ফের চলে যায় কিন্তু গাছের গুঁড়ি আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে তার নামটিও সে লিখে যেতে চায়! রণজিৎ নাম লেখেনি কিন্তু রেখে গেছে তার ঘামের গন্ধ!

নামই বা লেখেনি—কে বললে? আরে, এই যে একটা গানের খাতা পড়ে আছে। তার প্রথম পাতাটা খুলতেই গৌরী অবাক হল। গৌরীরই নাম লিখে রেখেছে এক কোনে কোন্ এক অপরিচিত হস্তাক্ষর।

—একি! আমার নাম কেন এখানে? গৌরী না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলো না।

আর জবাব দিল দুর্গা।—তোর নাম লিখবে না তো কী আমার নাম লিখবে? সত্যি ভাই, তোর রূপ দেখে আজ আমার হিংসে হয়। বিয়ে করলো অগ্নিসাক্ষী করে আমায় এক পরপুরুষ কিন্তু রূপে মুগ্ধ হল সে তোরই! কাল সমস্ত রাত সে

এখানে ছিল কিন্তু যা জ্বালান জ্বালিয়েছে, কী বলবো ? অনবরত তোর কথাই জিজ্ঞেস করেছে।

—তাই নাকি ? দুঃখেও হেসে ফেললো গৌরী। গালে তার গোলাপ ফুটলো।—কেন, আমি তোর বরের কী করেছি ?

—কী করেছিস ? পুরুষদের কাছে আবার সুন্দরী মেয়েদেব কিছু করতে হয় নাকি ? শুধু তাকালেই হল। ব্যস ! রূপে মুগ্ধ শ্যামরায় ! যে কবি, সে চললো অমনি কবিতা লিখতে। যে শিল্পী, সে অমনি দরজা বন্ধ করলো ছবি আঁকতে। যে হতাশ প্রেমিক, সে বেচারা অমনি হতাশা নিয়েই যাদবপুর হাসপাতালে গিয়ে উঠলো। শুধু একটু তাকানো। ব্যস ! তবে, তোর কথা আলাদা। তুই তো শুধু তাকিয়েই ছাড়িস নি, বাসরে যে গান গেয়ে ছিলিস, মনে আছে ?

—আছে, তার হবে কী

—কী হবে না, তাই বল।

গৌরীর গাওয়া গানটার বাণীরই হুবহু নকল রয়েছে গানের খাতায় ! আর সেটি লিখে গেছে রণজিৎ।

গৌরী বললে, এরকম জানলে তোর বিয়ের সময় এদেশে থাকতাম না।

—না থেকে কি আমার বিয়ে আটকাতে পারতিস ?

—আটকাতে হয় তো পারতাম না কিন্তু বিয়ের ওপর এই বাড়াবাড়িটুকু তো আর ঘটতো না ! এর জন্যে যদি তোর কষ্ট হয় আমিই তো দায়ী হবো।

—যে কষ্ট রাত্রে পেতে হয় ওর পাশে থেকে, তার চেয়েও কী বেশী কষ্ট হবে আমার ? বল না মুখপুড়ি !

ছোট করে একটা চড় মারলো দুর্গা—গৌরীর গালে।

আর গৌরী স্থির, অবাক হয়ে চেয়ে রইলো বোকার মতো। পরিবেশটি তার পক্ষে যেন কেমন অপরিচিত, অদ্ভুত ঠেকছিল।

কিন্তু তাকে নাড়া দিয়ে, তাকে নিমেষের মধ্যে অপ্রস্তুতের একশেষ করে, তাকে ধরে নিজের কোলের মধ্যে টেনে এনে দুর্গাই যেন সহসা মেয়ে থেকে পুরুষ বনে গেল।

—এ তোর হচ্ছে কি ? এরকম কচ্ছিস কেন ?

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গৌরী না বলে পারলো না।

উত্তর দিল দুর্গা।—হবে আর কী ? কাল সারা রাত ঘুমোইনি, আজও সারা রাত জাগবো।

—কার সঙ্গে ?

—তোর সঙ্গে। ধরে নে, আমিই তোর বর হলাম আর তুই হলি আজ রাতের মতো আমার বৌ। কেমন ? সম্বন্ধটা মনঃপূত হচ্ছে না ?

হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো দুর্গা।

গৌরী জিজ্ঞেস করলে, তুই সিদ্ধি খেয়েছিস নাকি ?

—সিদ্ধি নয়, বল মদ……

—তাহলে মদের নেশাটাই একবার জ্যাঠাইমাকে ডেকে এনে দেখিয়ে দিই—কী বলিস ?

—আ-মর হতভাগী! দুর্গা গৌরীকে জাপটে ধরলো ঃ —আচ্ছা…প্রদীপদার খবর কিরে?

—তার খবর কিছুই জানি না। গম্ভীর হয়ে গেল প্রদীপদার কথায় গৌরী।

—তবু যতোটুকু জানিস। দুর্গাও ছাড়বে না!

—কলকাতায় পড়তে গেছে, এই পর্যন্তই শুনেছি। আর কিছুই জানি না।

—তোর একটা খোঁজও নেয়নি এর মধ্যে?

দুর্গার বন্ধন শিথিল হয়ে এল।

—তার কী লাভ? গৌরী বললে।

—আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। দুর্গাও বাড়িয়ে চললো কথা ঃ গাই-বাছুরে ভাব থাকলে আবার লোকসান আছে নাকি?

—লাভ-লোকসান এখনো খতিয়ে দেখিনি। গৌরী বললে, ছাড়, আমার ঘুম পেয়েছে।

—অত সহজে ঘুম পেলে তোর নিষ্কৃতি আছে নাকি আজ? বরগুলো কতো বদমাস, শুনবি বলছিলি না? শোন, তবে তো ঘুমুবি।

দুর্গা থামলো। ফের প্রশ্ন করলো, হ্যাঁরে গৌরী, সত্যি কথার একটা জবাব দিবি?

—কী?

—আচ্ছা, প্রদীপদা তোকে কোনোদিন চুমু খায়নি?

—না।

—আঁচল ধরে টানেনি ?

—না।

—সবেতেই তো শুধু না—না করছিস। হাঁ হাঁ করবি কবে ? তুই বড্ড বোকা দেখছি। পরপুরুষকে বশ করতে পেরেছিস আর নিজের লোকটিকে বাঁধতে পারলি না ?

—পরপুরুষকে বশ করতে আমি চাই না। গৌরী ধীর, অবিচলিত কণ্ঠেই জবাব দিল।

আর দুর্গা বলে যেতে লাগলো : আজ ভোর বেলা তোর জামাইবাবু কী বললে জানিস ? বললে, সমস্ত রাত অন্ধকার ছিল বলেই বেঁচে গেলাম। আমি বললাম, কি রকম ? তোর জামাইবাবু বললে, বুঝতে পারছ না ? অন্ধকার বলেই তোমার দেহটাকে মেনে নিতে পেরেছি গৌরীর দেহ মনে করে। আলো থাকলে—এটা পারতাম না !

—কিন্তু বিয়ে হয়েছে জামাইবাবুর সঙ্গে দুর্গার না আমার ? গৌরী অসন্তুষ্ট হল।

—তা বলে কে ?

—কেন, তুই-ই বলতে পারতিস। টাকা দিয়েছিল আমার বাবা, না তোর বাবা ?

—সে কথা তুলে আর লাভ কী ? টাকা না নিয়েও তো অনেকে বিয়ে করে।

—যাই বল, গৌরী বললে, তোর বরটা ভারী অসভ্য।

—অসভ্য বলে অসভ্য? ফুলশয্যার রাত্রে—আমি তখন কিছুই জানতাম না……

তারপর, এমন সব কথা, এমন সব তথ্য দুর্গা অবলীলাক্রমে শোনাতে লাগলো, শুনিয়ে গেল গৌরীকে, যে, সে রাত্রে তার ঘুম হওয়া তো দূরের কথা, মাথাটা যেন আগুন হয়ে উঠলো। আর দেহের মধ্যে কী যেন তার হতে লাগলো যা নিজেই সে বুঝতে পারলো না।

এগার

দেখতে দেখতে আরো কয়েকমাস কাটলো। দিনের পর আরো কতো দিন। রাতের পর আরো কতো রাত···

প্রদীপের সঙ্গে যে ইতিমধ্যে গৌরীর আর দেখা হয়নি, এমন নয়। দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে দু'বার।

অমন সোনার কলকাতাও তার চোখে তিক্ত, ম্লান হয়েছে বার বার। কলকাতা তাকে আশ্রয় দেয়নি, আঘাত দিয়েছে। উপহার দেয়নি—উপহাস করেছে। বিষাক্ত বিষাদ এনে দিয়েছে তার মনে। কলেজের ছুটির পর তার অখণ্ড অবসরকে খণ্ডিত, টুকরো টুকরো করে দিয়েছে কলকাতার স্বপ্নময়ী সন্ধ্যা। এখানে লক্ষ লক্ষ বাড়ি, কোটি কোটি মানুষ। মায়াবিনীরও সংখ্যা কম নয়। কিন্তু কেউ—কেউ প্রবোধ দিতে পারেনি প্রদীপকে। এখানকার নিউমার্কেটে যখন সন্ধ্যা নেমেছে, সারি সারি আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অপরূপ সাজানো দোকানপাট, রাস্তায় রাস্তায় আর পার্কে পার্কে জ্বলে উঠেছে গ্যাসবাতি, সহরের ট্রামে-বাসে উপছে উঠেছে জনতা, পথে-পথে কাতারে-কাতারে ব্যস্ত মানুষের ভিড়, তখন সে কল্পনা করেছে, কল্পনায় দেখেছে তার সহজ শান্ত গ্রামটির গার্হস্থ্য রূপ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আকাশের রং ঘুরে চলেছে। গাছে গাছে পাখিদের কলরব, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি সুরু হয়েছে আর মাটির প্রদীপটি আঁচলের

আড়ালে প্রজ্জ্বলিত রেখে তুলসীতলায় প্রণাম করছে একটি মেয়ে।

কে সেই মেয়ে ?

গৌরী !

গৌরীর কথা ভাবতেই কী সে কলকাতা এসেছে, না পড়তে ? সঠিক জবাবটা সে ঠিক করতে পারে না। বাবা জানেন, প্রদীপ পড়ছে। প্রদীপ জানে, সে ভাবছে। দু'জনের ভাব এক কিন্তু কতো ভাবান্তর! তাই যখন অসহ্য হয়েছে, অবান্তর হয়েছে তার কাছে কলকাতার রুদ্ধকারার দিনগুলি—তখনি সে ছুটে এসেছে। ফেলে এসেছে কলেজের হোস্টেলে তার পাঠ্যপুস্তক। ছুটে এসেছে এই গ্রামেই। আর মাকে প্রণাম করেই এক ফাঁকে চলে এসেছে গৌরীর কাছে। তার এই চলে আসাটা আর কারো গাত্রদাহের কারণ হলেও হয়নি শুধু তার মার আর সুদীপ্তার। সুদীপ্তা হচ্ছে তার বৌদি। দাদার কথা ছেড়েই দাও। সে এখন ডাক্তার। বাড়িতে যতোটুকু কাল থাকে নিজের চিন্তাতেই সে বিভোর। বাইরে রোগীর চিন্তায়।

প্রদীপ এরই মধ্যে দু'দুবার দেখা করেছে গৌরীর সঙ্গে।

প্রথমবার আসতে সে কী যত্ন ত্রিলোচনার! ত্রিলোচনা আসন দিয়েছিলেন বসতে। খাবার করে দিয়েছিলেন খেতে। তারপর কতো কথা, কতো আশীর্বাদ, কতো অশ্রু, কতো ইতিহাস!

প্রদীপ শুনেছিল দুর্গার বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পর এসে সে বেশ কিছুদিন ছিলও এখানে। ফের চলে গেছে স্বামীর কাছে। কিন্তু গৌরী?

গৌরীর আজো বিয়ে হল না।

এ দুঃখ গৌরীর নয়, গৌরীর মা-বাবারও নয়। এ আঘাত প্রদীপের। এ কষ্ট প্রদীপেরই।

—তুমি কী বলো বাবা? কেঁদে জিজ্ঞেস করছিলেন ত্রিলোচনা প্রদীপকে—আর তো বল পাচ্ছি না মনে!

প্রদীপ কোনো উত্তর দেয়নি কিন্তু আড়ালে নিজেই কেঁদে ফেলেছিল। তারপর যখন সে গৌরীর মুখোমুখি হল, সরে গেলেন ত্রিলোচনা তখন যে, সে কী বলবে কিছুই ভেবে পেল না।

যতোখানি ম্লানদৃষ্টি আর করুণ কাকুতি নিয়ে গৌরী তাকালো প্রদীপের পানে ঠিক ততখানি ম্লানদৃষ্টি আর করুণ কাকুতিরই কী প্রয়োজন এসেছিল এখনই? প্রদীপের হাসি না এলেও মুখে প্রশ্ন এল। কিন্তু সে-প্রশ্ন তখনকার মতো সে চেপে রেখেই জিজ্ঞেস করলো, ভালো আছ গৌরী?

—হ্যাঁ, ভালো আছি। তুমি ভালো আছ প্রদীপদা?

—হ্যাঁ, খুব ভালো আছি।

—তাতো দেখতেই পাচ্ছি! কলকাতা গিয়ে বুঝি এই চেহারা হয়েছে তোমার?

গৌরী কথা বললে, না ধমকালো ঠিক ধরা গেল না।

প্রদীপ চুপ করেই রইলো।

গৌরী ফের প্রশ্ন করলো, এখানে কেন এসেছ ?

—এখানে মানে ? বোকার মতো জিজ্ঞেস করলে প্রদীপ, এখানে মানে, আমাদের বাড়ি, না তোমাদের বাড়ি, কোনটা বলছো ?

—এই আমাদের বাড়িই ধরো।

—তোমায় দেখতে আসায় কিছু দোষ আছে ?

—এত দেখেও কী দেখা শেষ হয়নি ?

গৌরী হাসলো না কাঁদবার ছল করলো, বোঝা শক্ত।

—তুমি যদি বিরক্ত হও, আমি না হয় না আসবো।

প্রদীপও আর, না বলে থাকতে পারলো না।

—আমি বিরক্ত হবার কি ? আর বিরক্তই বা হতে যাবো কী দুঃখে ?

গৌরী আর তাকাতে পারেনি প্রদীপের পানে।

খানিকটা থেকে প্রদীপ উঠে এসেছিল।...

নীরবেই চলে যাচ্ছিল, সহসা পেছুতে ডাকলো তাকে গৌরী। বললে, এখনি চলে যাচ্ছ নাকি প্রদীপদা ?

—এখনি আবার কোথায় ? এতক্ষণ তো রইলাম।

—আচ্ছা যাও, দেরি হলে তো বাবা তোমার বকবেন, না ?

বাবা বকবেন, কথাটা কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছেলের পক্ষে খুব শ্রুতিমধুর নয়। কাজেই কী জবাব দিয়ে প্রদীপ চলে যাবে তাই ভাবতে লাগলো।

কিন্তু রেহাই দিল তাকে গৌরীই। কথা থেকে এল কথান্তরে। বললে, পড়াশোনা ভালো হচ্ছে তো ?

—ভালো না হলে বাবা ছাড়বেন কেন !

গৌরী শুনে শুধু চেয়ে রইলো।···

এক মিনিট কেটে গেল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গৌরী বললে, আচ্ছা, আবার এসো—কেমন ?

গৌরী আর তার গতিকে ব্যাহত হতে দিল না।

—আসবো।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে আর কিছু শুনতে পায় কিনা তাই দেখলো প্রদীপ। তারপর যথাবিহিত পথেই নেমে এল।

এ তো গেল প্রথম।—

তারপর দ্বিতীয় দফা।

দ্বিতীয় দফায় যখন প্রদীপ এল গৌরীদের বাড়ি তখন আবহাওয়া অন্য রকম।

ত্রিলোচনা না করলেন প্রদীপকে যত্ন, না দিলেন আসন পেতে। না করলেন আপ্যায়ন, না আশীর্বাদ। জ্বরে তিনি তখন চিঁ চিঁ করছেন। হাত তুলে কী যেন দেখালেন। সেই দেখেই প্রদীপ ঘরের বাইরে এল বেরিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গৌরীর সঙ্গে। গৌরী তখন উত্তরসন্ধ্যায় রান্নাঘরের কাজে ছিল মগ্ন। কী যেন নিতে এসেছিল এ-ঘরে আর তারপরই···

—প্রদীপদা এসেছো ? এসো, ভালো আছ ?

—ভালো না থাকলে আর আসতে পাচ্ছি কী করে ?

কাকীমার শরীর অত খারাপ দেখছি কেন গৌরী? অসুখ করেছে নাকি?

—হ্যাঁ। আজ কদিন থেকেই মায়ের জ্বর, ম্যালেরিয়া বোধ হয়।

—তাই তো! তা কাউকে দেখানো হচ্ছে না?

—কাকে আর হবে? গরিবদের অত সহজে ডাক্তার ডাকলে চলবে কেন?

—কিন্তু আমার দাদাকেও তো ডাকলে পারতে।

—তুমি আস বলে কী তোমার দাদার ওপরও আমাদের অধিকার এসে গেছে? না, দাদা তোমার দাতব্য দোকান দিয়েছে?

একটু থেমে :

—তুমি তো কলকাতায় থেকে বেঁচে গেছো। আমার জীবনে আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই প্রদীপদা।

—কেন বলো দেখি গৌরী?

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো প্রদীপ গৌরীর মুখের দিকে। অত্যন্ত অপরাধী—অত্যন্ত হীন বলে তার মনে হচ্ছিল নিজেকে। কী ব্যাপার হয়েছে—শত চেষ্টা করেও সে বুঝতে পারলো না।

গৌরী বললে, বোসো প্রদীপদা, বসবে চলো। তারপর কবে এসেছো এখানে?

—কবে নয়, বলো কখন।

—তাই জিজ্ঞেস করছি।

—এই মাত্র কলকাতা থেকে এসে বাড়ি গেছি, তারপর-ই বোধ হয় মিনিট পাঁচ হবে, তোমাদের কাছে এলাম।

গৌরীর নির্দেশ মতো প্রদীপ গিয়ে ঘরের ভিতর বসলো।

—তারপর···কাকাবাবু কোথায় ?

—বাবা ? বাবা গেছেন পাশের গাঁয়ে। কাদের বাড়ি যেন শ্রাদ্ধ হবে, তাই তারা ফর্দ করাতে ডেকে নিয়ে গেছে।

—এই রাত্রি বেলা ?

—গরিবের আবার দিনরাত্রি !

গৌরীর হাসিতে নগ্ন হয়ে উঠলো তাচ্ছিল্যের নির্দয় তমিস্রা। তখনি সামলে নিল সে নিজেকে। বললে, পড়াশোনার আর কতো বাকী ?

—এই আই-এ এগজামিন দিয়ে এলাম।

তারপর দু'জনেই চুপ। খানিকটা স্তিমিত-স্তব্ধতা যেন উন্মাদ উর্ণনাভের জাল বিস্তার করে চললো। মানুষ রইলো না। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলীকৃত হতে লাগলো মাথার উপর।

গৌরী আগের চেয়ে ঢের বেশী মুখর, ঢের বেশী স্থূল, ঢের বেশী সচেতন মনে হল। পাতার আগালেই ফুলের আকুলি-বিকুলি, ফুলের সলজ্জতা। ঝড়ে সে পাতা উড়ে গেলে ফুল আর সেখানে ফুল নয়। তখন সে ফল। ফল হয়েই যুঝতে থাকে। ফাগুন আসে ফগুয়ার গুঁড়া নিয়ে নয়। আগুন নিয়ে, আলো নিয়ে। যে আগুন—যে আলো উড়ে উড়ে ধরিয়ে চলে

খড়ের ছাউনি, গোলপাতার কুঁড়ে, গরিবের গর্বিত আবাস স্থল। তারই কী ইঙ্গিত দেখতে পেল প্রদীপ গৌরীর চোখে?

কোথায় যেন একটা খোঁচা—একটা তীব্র অস্বস্তিবোধ, তাকে ধীরে ধীরে—পাক দিয়ে দিয়ে চঞ্চল করতে লাগলো।

গৌরী বললে, বোসো। তোমার জন্যে কিছু খাবার করে আনি।

চট করে লাফিয়ে উঠে বাধা দিল তাকে প্রদীপ। বললে, না, খাবার এখন থাক। তোমার কথাটা ভালো করে না শুনলে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না গৌরী। তুমি আমায় বিশ্বাস করো। কী হয়েছে—খুলে বলো।

—কিসের কী হয়েছে? গৌরী যেন নিমেষেই বদলে গেল।

—কেন তুমি বললে, তোমার জীবনে আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই গৌরী?

—এর মধ্যে ব্যাখ্যা করবার এমন কী আছে? তুমি কী ছেলেমানুষ হয়েছ? বুঝতে পারলে না—আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম?

গৌরী তবুও ধরা দিল না। আর, আরো বেশী জেদ, আরো বেশী রোক বেড়ে গেল প্রদীপের।

—একান্তই শুনবে? গৌরীরও খুব কষ্ট হতে লাগলো তার প্রদীপদার এই প্রত্যুন্মুখ মুখ দেখে। বললে, বলতে পারি, যদি না মাথা গরম করো।

—তাই প্রতিজ্ঞা করলাম। মাথা গরম করবো না।

—কিন্তু এ অহেতুক কৌতূহলে তোমার কী দরকার বলো দেখি প্রদীপদা ? তুমি এখন পড়ছো, ছাত্রের পক্ষে অধ্যায়নই তো তপ। সেখানে অন্য কথা ভাবাও অন্যায়। যদি কোনো গরিব দুঃখী রোগী অসুখে ওষুধ না-ই পায়, তাতে জগতের কী এলো গেলো ? তা ছাড়া ছেলের বাবা যদি কোনো মেয়ের বাবাকে দু'কথা শুনিয়ে বাড়ি থেকে বার করেই দিয়ে থাকেন—তাতে খুব অন্যায় তো দেখি না !

—আর বলতে হবে না তোমাকে। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

প্রদীপ দাঁড়িয়ে ছিল। ফের বসে পড়লো। বললে, কিন্তু কাকাবাবুই বা কেমন বুঝতে পারছি না তো। গ্রামে কী আমার দাদা ছাড়া আর ডাক্তার নেই ?

—তুমি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারই বা ধরছো কেন প্রদীপদা ? এর মধ্যে তো তোমার দাদার প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর সঙ্গে বাবার দেখাই হয়নি। তাঁর দোষ কী ? শুনলে হয় তো তিনি আসতেন। কিন্তু মা যখন সেরেই উঠেছেন তখন আর ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন কী আছে ? তাছাড়া মেয়ে মানুষের জীবন অত ক্ষণস্থায়ী নয়। ডাক্তার না এলেও মা বাঁচবেন। তোমার জন্যে কিছু খাবার আনি, কেমন ?

—কিছু করতে হবে না, তুমি বরং একটু জল দাও।

—শুধু জল কী দিতে আছে ? দুটো নারকেল নাড়ু আনি বরং।

গৌরী চট করে পাশের ঘর থেকে নাড়ু আনলো।

নাড়ু নিয়ে জল দিতে যাচ্ছিল; সহসা কে যেন বাইরে থেকে ডাকলো।—উমাশংকর আছো?

উমাশংকরের অবর্তমানে কে আর বেরুবে, গৌরী ছাড়া?

উমাশংকর নেই কিন্তু গৌরী আছে।

কথা বলে গৌরী ফিরে এল……

তার তখন মাথা হেঁট হয়ে গেছে। সমস্ত মুখটা কেমন ফ্যাকাশে, ম্লান। কী যে সে তখন প্রদীপকে বলবে, ভেবে পাচ্ছে না যেন।

প্রদীপ জলের গেলাস হাতে করে প্রশ্ন করলো, কে এসেছিলেন?

—ও-পাড়ার গৌরখুড়ো।

—কী বলে?

—যা বলে, তোমার না শুনলেও চলবে। তা ছাড়া, এ সব কথা শোনা তোমার অনধিকারচর্চা।

—তা যদি হয়—শুনবো না।

—কিন্তু একদিন তো শুনতেই-হবে।

—যদি না শুনলে চলে, শুনবো কেন?

—শুনতে তোমার না-ভালো লাগতে পারে কিন্তু বলতে আমার সত্যিই ভালো লাগছে।

গৌরী চোখ বুজলো। আর চোখের দুটি পাতা তার সহসা অশ্রুতে স্নিগ্ধ, সমুন্ন হয়ে গেল। যেন কতো আনন্দের আবেশ

…সুখ স্বপ্নের শিহরণ তার শরীরের উপর দিয়ে হিমেল হাওয়ার মতো হেলে দুলে চলে গেল।

গৌরী বললে, গৌর খুড়ো—এই বাজারে আমাদের বড় হিতাকাঙ্খী। তিনি আমাদের জন্যে বড় বেশী ভাবছেন!

গৌরী চুপ করলো।

আর প্রদীপ চেয়ে রইলো অনুসন্ধিৎসুর অস্থিরতা নিয়ে।

গৌরী বললে, তাই একটি পাত্র জোগাড় করেছেন। তোমার মতো বড় লোক নয়, গরিবই অবশ্য কিন্তু তার মন ভারী বড়। বয়েস পঞ্চাশেরও কিছু বেশী কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্তের প্রতি তিনি বড় করুণ। বাবাও তাই ঠিক করেছেন কন্যাকে তাঁর পাত্রস্থ করবেন……

সহসা গৌরীকে থামতে হল আর নিমেষে সে ব্যস্ত, চঞ্চল হয়ে উঠলো বাঁধভাঙা-নদীর মতো।

—একি! একি! কী হল—কী হল তোমার প্রদীপদা?

যা হবার তাই প্রদীপের হয়েছিল। হাত থেকে জলভর্তি গেলাসটা তার পড়ে গেল মাটিতে। যে জল সে তখনো মুখে ঠেকায়নি। মাটি ভিজুক—ক্ষতি নেই কিন্তু অমন হল কেন? চোখ বুজে এল প্রদীপের। প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল দু'টি চোখ। আর মাথা হেলে গেল তার বুকের উপর। মানুষটা মরে যাবে নাকি?

কী—কী করতে পাবে গৌরী এই সময়? ত্রস্ত, ক্ষিপ্র গতিতে সে এগিয়ে এল প্রদীপের পাশে। প্রদীপের মাথাটা

উঠিয়ে নিল। আপনার স্থূল, মাংসল বুকের উপর সে চেপে ধরলো প্রদীপকে আর কাতর হয়ে ডাকলো—প্রদীপদা! প্রদীপদা!

প্রদীপ তখনো সাড়া দিল না দেখে সে সত্যিই বড় শঙ্কিত হয়ে পড়লো। তারপর নিজেই তার দেহটা ধরে তক্তাপোষে শুইয়ে দিল। তখনো প্রদীপ অচেতন, তখনো সে নির্বাক। প্রদীপের বুকে—তার জামার তলা দিয়ে—গৌরী ঠাণ্ডা, নরম হাতখানি নিয়ে গিয়ে বোলাতে লাগলো।

ও-ঘরে জ্বরে শায়িত মা, এ-ঘরে অচৈতন্য প্রদীপ!

দু'জনের মাঝখানে একাকিনী গৌরী! ঘোড়সওয়ার বর্গি সৈন্যের মাঝখানে একটি অচ্ছদ্মা দেবিমূর্তি। এক ঘণ্টা আগেও সে জানতো না এই হবে—এই ঘটবে। এই ঘটতে পারে।

অবশেষে জলের ঝাপটা দিল প্রদীপের মুখে। ঝাপটার পর ঝাপটা। আর কাজ হল তাতেই।

প্রদীপ ধীরে ধীরে জাগলো। জাগলো তার স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়নীলিমা। আর তার দুর্বল দুটি হাত দিয়ে সে বরণ করলো, বন্দী করলো গৌরীর দুটি যুগোল বাহু।

অনেকটা বল ফিরে এল গৌরীর মনে। অনেকটা সাহস। আর অনেকখানি বিলিয়ে দিয়ে গৌরী নিজেকে ছড়িয়ে বসলো।

—এখন কেমন বুঝছো? খুব কষ্ট হচ্ছে কী প্রদীপদা?

গৌরীর কণ্ঠ স্নেহে সুশীতল। সারল্যে স্নিগ্ধ।

প্রদীপ গৌরীর হাতের উপর বোলাতে লাগলো হাত। খুব

সন্তর্পণে, খুব সম্প্রসাদত্তায়। বললে: মাথাটা কেমন ঘুরে গেছলো, তাই তোমায় অমন ব্যস্ত করলাম। বড্ড পিপাসা, একটু জল দেবে?

জল গৌরী দিল না। রান্নাঘর থেকে ত্বরিত একটু দুধ গরম করে আনলো। তাই দিল খেতে প্রদীপকে।

প্রদীপ মুখে তুলতে আর আপত্তি করলো না। দুধটুকু সবটা খেয়ে নিল। খেয়ে বললে, এবার একটু সুস্থ হবো, মনে হচ্ছে।

—কলকাতায় থেকে শরীরটা সত্যিই তোমার গেছে একেবারে। এভাবে চললে বাঁচবে কদিন? একটু যত্ন নাও দেহের।

প্রদীপ শুনলো। উত্তর দিল না।

খানিক পরে গৌরী বললে, এখন কেমন বোধ করছো?

—ভালো।

—কিন্তু কী হল বলো দেখি তোমার? বেটাছেলের হাত থেকে তো গেলাস চট করে পড়ে না। সত্যিই কী—এ তোমার দুর্বলতা, না অন্য কিছু?

—অন্য কিছু হলেই বা কী করতে পারি, চট করে বলা শক্ত! একটু ভাববার সময় দাও।

—কী ভাববে এত?

প্রদীপ মৌন হয়ে রইলো খানিকক্ষণ।...

তারপর, নিজেই নিজের কথাটা বললে আবেশ ভরে।

বললে, এ বিয়ে তোমার আমি হতে দেবো না গৌরী। অন্ততঃ, আমি বাধা দেবো!

—বাধা দিলেই তো বাধিত হই। কিন্তু শুধু বাধাই দেবে?

গৌরী হেসে ফেললো এবার: বাঁধবার চেষ্টা করবে না নিজে থেকে?

—বাঁধা তো তুমি পড়েই আছ গৌরী। নূতন করে আর কী বাঁধবো? একটু স্থির হও, দেখি কী করতে পারি···

—অস্থির তো আমি হইনি, যাঁর হবার কথা তিনিই হয়েছেন।

—না না না। প্রদীপ এগিয়ে গেল। যেন এগিয়ে গেল সে গৌরীকে ধরবার জন্যই।

আর ঠিক সেই সময়ে কেসে, উঠানে এসে পা দিলেন উমাশংকর।

বার

পরদিন সকাল থেকেই আর প্রদীপকে পাওয়া গেল না বাড়িতে। না দেখতে পেলেন তাকে মহামায়া, না দেখতে পেল তাকে সুদীপ্তা। না সন্দীপ, না অন্য কেউ।

মহামায়া বললেন, গেল কোথায় ছেলেটা? বৌমা, তুমি কিছু জানো?

সুদীপ্তা বললে, রাত্রি বারটায় দেখেছিলাম তাকে ঘরে থাকতে। মানে, তখনো ঘরের আলো জ্বালা ছিল। সকালে উঠে তো আর দেখতে পাচ্ছি না!

—কী ব্যাপার বলো দেখি?

—তা তো মা জানি না।

—সকলেই যদি কেউ না জানো, তবে কী সে অদৃশ্য হয়ে গেল?

সন্দীপ বললে, মা, পৃথিবীটা তো আর ছোট নয় যে একই জিনিস একই স্থান থেকে সকলের চোখে দৃশ্যগোচর হবে। চন্দ্র-গ্রহণ দেখনি?

—দেখেছি তো।

—কী দেখেছ? সব জায়গা থেকেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

মহামায়া অতিমাত্রায় মায়াকাতর হয়ে চেয়ে রইলেন।

জের টেনে চললো সন্দীপ: হয়তো এখানে সে অদৃশ্য কিন্তু

আর একজায়গায় ঠিক পরিদৃশ্যমান। তোমার কাছে অনুপস্থিত কিন্তু আর একজায়গায় সে ঠিক উপস্থিত। কে বলতে পারে কার কথা?

বেলা বাড়তে লাগলো দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ন এল। অপরাহ্ন গড়িয়ে দিনান্ত।

প্রদীপ এলো না। প্রদীপের ঘরে এমন কোনো চিঠিও পাওয়া গেল না, যাতে করে বোঝা সহজ হয়, সে কোথায় গেছে, কেন গেছে।

—কী হল কি ?

মায়ের প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

মহামায়া ডাকেন, বৌমা······

বৌমা এগিয়ে আসে।

—আচ্ছা, কেউ কিছু বললো নাকি ওকে ? না বললে ও কি এমনি-এমনি চলে গেল ?

মহামায়া এতক্ষণে একটা সমাধানে এসেছেন। প্রদীপ যে চলে গেছে এবং রাগ করেই গেছে এতে আর ভুল নেই। এ দিবালোকের মতোই দেদীপ্যমান, নদীর উজ্জ্বল শ্রোতধারার মতোই সত্য।

মহামায়া বললেন, সে তো তেমন ছেলে নয় মা আমার। কলেজের ছুটি হয়েছে, কোথায় বাড়ি এল থাকবার জন্যে, আর

কিনা এক রাত্রি কাটতে না কাটতেই হাওয়া! কোথায় যাবো বলো দেখি আমি ?

মহামায়াকে এতটা কাতর—এতটা চঞ্চল হতে আর দেখা যায়নি।

সে রাত্রে তিনি কিছুই মুখে দিতে পারলেন না। বার বার মনে হতে লাগলো প্রদীপ আসবে, প্রদীপ বুঝি আসবে ফের রাত্রিতেই। সযত্নে প্রদীপের খাবার আগলে তিনি বসে রইলেন। বসে রইলেন সমস্ত রাত্রি—রাত্রির সমস্ত প্রহর পাহারা দিয়ে।

সে রাত্রিও কাটলো, প্রভাত হল।......

প্রদীপ কিন্তু এলো না।......

মহামায়া আহত পাখির মতো ছট ফট করতে লাগলেন। প্রদীপ মায়ের কাছে যদি কখনো অবাধ্য হয়ে থাকে তো এই প্রথম। এই প্রথম, প্রদীপের বিদ্রোহ-ঘোষণা, প্রদীপের না বলে, না জানিয়ে অন্তর্ধান। সকলকে তুচ্ছ করে, অগ্রাহ্য করে তার এই উন্মাদ পলায়ন। অস্থির উল্লঙ্ঘন।

—আর কী করতে পারা যায় ?

মহামায়া ফের সুদীপ্তাকে ডাকলেন—আর কী করতে পারা যায় ?

—ওর বিয়ে দেওয়া ছাড়া আমি তো কোন গতি দেখি না।

সুদীপ্তা মরিয়া হয়েই রায় দিল। আর তাইতে একটা ভালো কথা, ভালো প্রস্তাব মনে পড়লো মহামায়ার।

—তুমি একটা জিনিস করতে পারো বৌমা? বড় উপকার হয় তাতে। যদি একবার একটা কাজ করো।

—কী বলুন?

—তুমি যদি গৌরীদের বাড়ি গিয়ে একবার খোঁজ নাও। অবশ্য রামকেও পাঠাতে পারি। কিন্তু রাম তো আর হাঁড়ির খবর আনতে পারবে না। বাড়ির খবর আনতে পারে বড় জোর। রামকে নিয়েই তুমি বরং একবার যাও। এই ফাঁকেই যাওয়া চলে। কর্তা কলকাতা গেছেন, দুপুরের গাড়িতে ফের আসবেন। তখন আর যাওয়া চলবে না তোমার।

—তাই তাই। আমিই যাই।

সুদীপ্তা ধনী-কন্যা কিন্তু কৌতুকময়ী। শুধু সুশ্রী নয়, সুচতুরাও।

গত পরশু প্রদীপ বাড়ি আসে। এসে এসেই পালায় গৌরীদের বাড়ি। এটুকু লক্ষ্য করেছিল পূর্বের মতোই ভারী অলক্ষ্যে সুদীপ্তা। সুদীপ্তা এও লক্ষ্য করেছিল, প্রদীপ তার সুটকেস রেখে চলে গেছে। তখন আর সে কৌতূহলনিবৃত্তি করতে পারেনি। সেই সুটকেসের-ই জিনিস-পত্র সে ওলোট-পালট করে আর হাতে ওঠে ছোট একটা বাক্স! ভেলভেটের। অতঃপর কী আশ্চর্য! বাক্সের মধ্যে এক জোড়া কানপাশা……

এ কানপাশা আর কারো নয়। গৌরীর! গৌরীর জন্যই আনা। এ সে স্পষ্ট দেখতে পেল তার কল্পনার চোখ দিয়ে।

চোখে কল্পনার দূরবীন এঁটে! প্রদীপ যে গৌরীকে কতো ভালোবাসে তার আঁচ দিয়েছিল কিছু কিছু সে, আগেই তার বৌদিকে! ভালোবাসার সব চেয়ে দুর্বলতা কি, মনের কথা চেপে রাখা দুঃসাধ্য! না জানিয়ে বিয়ে আর না সাক্ষী রেখে প্রেম—দুটোরই শিকড় বড় সরু। না জানিয়ে ব্যাভিচার—সেটা বরং বিয়ের চেয়ে বড়। কিন্তু না জানিয়ে প্রেম, জলবিছুটির মতোই জ্বালাময়! তাই অনেক কথার ভিতর দিয়ে, অনেক চিঠির মারফতে, কাজল প্রহরের অনেক অবসরে প্রদীপ জানিয়েছে, প্রদীপ জানতে দিয়েছে তার বৌদিকে তার গোপন গৌরব—তার প্রেমের কটি পরিচ্ছেদ! প্রদীপ যে কলকাতার কলেজে পড়েও ছেলে পড়ায়—এখবর আর কেউ জানে না সুদীপ্তা ছাড়া। আর ছেলে যে পড়ায়, মাসিক কিছু কিছু পায়—তার পরিণামও নিশ্চয় একটা পরিণতির তট পাবে। তাই পেয়েছে! গৌরীর প্রেমের পথে এই কানপাশাটাই হয় তো ছিল প্রথম পাথেয়! সেটিও ভুলে গেছে প্রদীপ নিয়ে যেতে। কী, নিয়ে যেতো সে পরে! আর আরো আশ্চর্য, যাবার সময় পর্যন্ত একবার খোঁজ করেনি! খোঁজ করেনি—এটা কী হল, এটা কে নিলো!

সেই কানপাশাটাই—প্রদীপের হয়ে সুদীপ্তা নিয়ে গেল আঁচলে বেঁধে গৌরীদের বাড়ি।

গৌরী তখন অসুস্থ-মায়ের কাপড় বদলে দিচ্ছিল। রত ছিল ত্রিলোচনারই সেবায়। আর সেই দৃশ্য দেখে, সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তা বিস্মিত, বিমূঢ় হয়ে গেল। এমন

কি, ত্রিলোচনাকে নমস্কার করতে পর্যন্ত ভুলে গেল। অথচ ত্রিলোচনাই দেখিয়ে দিলেন গৌরীকে, কে যেন এসেছে। চুপি চুপি বললেন, ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা।

সুদীপ্তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হল গৌরীর। সুদীপ্তাকে গৌরী চেনে।

সুদীপ্তা বললে, এত অসুখ অথচ তোমরা খবর দাওনি!

—খবর যে দিইনি সেটা বলা অবান্তর। সেটা বরং আপনার শ্বশুরমশাইকে জিজ্ঞেস করবেন। এখন দেখছি, আমিই হয়েছি কাল। জগতে হাজার নয়, দু'হাজার নয়—দুটো জাতি মাত্র—দুটো জাতিতেই অহরহ ঠোকাঠুকি, অহরহ গোলমাল। এক ধনী, অপরটি নির্ধন। এ দুজনার মাঝে আমার মতো মেয়েরাই সমাজের শোচনীয় শিকার। আমার মতো মেয়েদের আর মুক্তি নেই!

গৌরীর চোখে এল জল।

—ছি, ভাই! অতটা হতাশ হবার কিছুই হয়নি! দুঃখ কোরো না। আমি যতোটুকু জানি···প্রদীপ তোমায় খুব ভালোবাসে। প্রদীপের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়—এ আমার আন্তরিক বাসনা। যে যাই বলুক, আমি বিশ্বাস করি, ইচ্ছা যদি প্রবল হয়, সমাজের শাসন সেখানে দুর্বল হবেই! ধনী-নির্ধন প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে মানিয়ে নিতে পারা, খাপ খাওয়ানো! ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই করি, আমার শ্বশুরের যেন মতি ফেরে। ধূলোমুঠি করে তোমায় তুলে নিয়ে গিয়ে যেন তিনি

সোনামুঠি দেখতে পান! এর বেশী আর কী বলবো ভাই! বিশ্বাস করো, আমি তোমার বোন। তোমার সুখদুঃখে আমাকে একান্তই যদি স্মরণ করো, অন্ততঃ আমার পক্ষ থেকে পক্ষাঘাতগ্রস্তের নিষ্ক্রিয়তা তোমাকে উপহার দেবো না। যা দেবো—তাতে খাদ থাকুক কিন্তু সোনাও থাকবে। শোক থাকুক কিন্তু সান্ত্বনাও দেবো!

আঁচল খুলে সুদীপ্তা ভেলভেটের বাক্সটি বার করলো।

—তাই বলে ভেবো না, এটা আমি তোমায় দিচ্ছি। সুদীপ্তা বললে, এটা প্রদীপই এনেছিল কলকাতা থেকে, আমি তখন অত্যন্ত অন্যায় করে এটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু আসল মালিকই এখন লুকিয়ে পড়েছে। তাই, আর কাছে কাছে কতক্ষণ রাখবো? তোমার জিনিস তোমাকেই পরিয়ে দিলাম।

সুদীপ্তা গৌরীর দু'কানে দুটি পাশা পরিয়ে দিল সযত্নে। মুখখানি ধরে আদর করে বললে, এমন চাঁদমুখ থাকতে মুখপোড়ারা কেন যে টাকার জুতো খেতে চায়, সত্যিই বুঝতে পারি না বোন! প্রদীপ যদি আমার ছেলে হত, তোমায় আগে বৌ করে ঘরে নিয়ে যেতাম।

সুদীপ্তা আবেগচঞ্চল একটি চুমু একে দিল গৌরীর মুখে।

গৌরী এতটা আশা করতে পারেনি। এতটা ভাবতে পারেনি। কী বলবে—বুঝতে পারলো না।

বুঝতে পারলো না কিন্তু কাঁপতে লাগলো থর থর করে।

সুদীপ্তা বললে, তোমার মায়ের জন্যে ভেবো না গৌরী। এখনি গিয়ে আমি আমার মালিককে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওষুধ দেবে, দরকার হলে ইনজেকশনও দেবে। সেরে উঠবেন উনি। কিন্তু ভাই একটা মুস্কিল হয়েছে।

—কী মুস্কিল ?

গৌরী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

—প্রদীপকে কাল সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না বাড়িতে। সকালের ট্রেনেই সে চলে গেল কিনা—জানা যাচ্ছে না। মা বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন।

—সে কী! আমি তো কিছুই জানি না। তার কী থাকবার কথা ছিল ?

—ছিল তো শুনেছিলাম। তুমি কিছু জানো ?

—সে সম্বন্ধে তো কোনো কথাবার্তা হয়নি আমার সঙ্গে। তবে প্রদীপদার শরীরটা ইদানিং বড় খারাপ—দেখলাম। এখানে আসার পরই সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে হয় তো বাড়ি ফিরেছে! আপনিও যে ভাবিয়ে গেলেন দেখছি!

শেষ কথার জবাব দিল না সুদীপ্তা। উত্তরোত্তর প্রশ্ন করতে লাগলো। আর, কী কারণে অচৈতন্য হয় প্রদীপ তাও জানলো। আর এটুকুও জানলো, প্রদীপের বিয়ের প্রয়োজন আশুই আর সেইটাই হওয়া এখন বিশেষ বাঞ্ছনীয়! আর বাঞ্ছনীয় গৌরীর সঙ্গেই।

সুদীপ্তা চলে এল বিদায় নিয়ে।

বাড়িতে এসে স্বামীকেও যেমন পাঠালো ত্রিলোচনার চিকিৎসায়. শ্বশ্রুমাতার কাছেও তেমন কথাগুলো সে পাড়লো।···

কিন্তু গোল বাধলো বীরেন্দ্রকিশোরকে নিয়ে।

বীরেন্দ্রকিশোর বিকালবেলা টেবিল চাপড়ে বললেন, এ অসম্ভব! আমি বেঁচে থাকতে এ অসম্ভব! ছেলের বিয়ে না হয় না হোক, তবু—ও হাঘরের মেয়েকে আমি আনতে পারবো না বাড়িতে। আমি অন্য জায়গায় সম্বন্ধ ঠিক করেছি। দিন চারেক বাদে তারা ছেলেকে দেখতে আসবে।

—ছেলেকে আর পাবে কোথায় তারা? তাহলে তোমাকেই দেখে যাক। মহামায়াও এবার মরিয়া হলেন।

—ছেলেকে পাবো না মানে? বীরেন্দ্রকিশোর চনমন করে উঠলেন, কেন, সে বাড়ি আসেনি গরমের ছুটিতে?

—বাড়ি এসেছিল কিন্তু যেমন এসেছিল তেমনি চলেও গেছে।

—কৈ, আমাকে তো সে বলে গেল না?

—তুমিই কী তাকে বলে কলকাতায় গেছলে, যে, সে অপেক্ষা করে থেকে তোমায় বলে যাবে?

—বটে! যতো বড় মুখ নয় ততো বড় মুখোস! ছেলের অধীন আমি, না আমার অধীন ছেলে?

—-তার জবাব ছেলেই দিতে পারে!

—কিন্তু যদি না পারে, তাহলে?

—তাহলে কী করবে ?

—কী করবো নয়, কী করতে পারি সেই কথারই আলোচনা হোক।

—কিন্তু ছেলে তো এখন বড় হয়েছে।

মহামায়া বাধ্য হলেন স্বর নামাতে।

—ছেলেকে বড় হবার অধিকার কে দিল ? আর বড় হলেই বা মানছে কে তাকে ?

হাঃ হাঃ হাঃ ! অতি ক্রূর, অতি দাম্ভিকের মতো হেসে উঠলেন বীরেন্দ্রকিশোর।—যদি বড়ই হয়ে থাকে, তাকে ছোট করবার অস্ত্রও আমারই হাতে।

বীরেন্দ্রকিশোর যেন বাড়ি বসেই বীরত্ব দেখাতে উন্মুখ, বিপ্লব আনতে উৎসুক। বাড়ি বসেই যেন দাড়ি ছিঁড়ে বেড়াতে চান।

—দেখবে গিন্নী, ওই ছেলেই তোমার সুড় সুড় করে যথাসময়ে বাড়ি এসে হাজির হবে ! কলকাতা থেকে লোক আসবে তাকে দেখতে। এই বিয়ে হোক আর না হোক, তবু বীরেন্দ্রকিশোর যতোক্ষণ বেঁচে আছে, চালকলা বাঁধা এক ভিখারীর মেয়েকে ঘরে আনবে না। বেটার এত তেজ, সেদিন কিনা সন্দীপকে ডাকতে এসেছে ! বলে কিনা, বাড়িতে অসুখ ! আরে বাড়ি তোর হেজে যাক, পুড়ে যাক, আমাদের কী ? সন্দীপকে ডাকতে এসেছিস ? কতো টাকা ফি দিবি তুই শুনি ? সন্দীপ যাবে তোর বাড়িতে ? তোর নষ্টচরিত্র মেয়ের কাছে ? সেদিন শুধু মারিনি, দয়া করেছি। দয়া করে দুটা কথা শুধু

বলেছি। কিন্তু এর পর? এর পর এলে আর ক্ষমা নেই, মায়া নেই। যেটুকু বাকী রেখেছি, তাও শেষ করবো। বাকী বা বকেয়া আমি কিছু রাখবো না।

বীরেন্দ্রকিশোর যেমন বলে গেলেন, শুনে গেলেন তেমনি মহামায়া। শুনে গেল তেমনি সুদীপ্তা। কারো প্রতিবাদ করবার সাহস রইলো না। দুর্বার দানবিকতার কাছে নেই দুষ্প্রাপ্য দয়ামায়ার দাক্ষিণ্য। মনুষ্যত্বের মহানুপ্রাণতা।

সুদীপ্তা বুঝলো সবই আর যেটুকু বাকী ছিল তাও পরিষ্কার হল সন্ধ্যাবেলা।

সুদীপ্তা অনেক আশাবাদী। তাই একটু বেশী আশা করেই শ্বশুরের শ্রীচরণে সে তেল মালিশ করতে গেল। এ-মালিশ সে প্রায়ই করে। আজো তার প্রক্রিয়ায় তাই আনলো না সে শৈথিল্য। বরং একটু বেশী ধৈর্যের, বেশী শক্তির পরীক্ষায় সে নিযুক্ত হল, যদি কিছু সুরাহা করা যায়। শক্তিমানকে সন্তুষ্ট করে যদি কিছু চমক আনা যায় চমৎকার কোনো প্রতিক্রিয়ায়। তাই যখন বীরেন্দ্রকিশোরের মন অনেকটা তৈল ঢালা স্নিগ্ধতনু —আর তিনি কথা পেলেই বার্তা শোনাতে পারেন তখনই সুদীপ্তা ডাকলো—বাবা।

—কী মা?

—বলছিলাম কী······একটা ঢোঁক গিললো সুদীপ্তা, বলছিলাম কী, ঠাকুরপোর ইচ্ছে···

—কী ইচ্ছে বলো···

—তার ইচ্ছে, গৌরীকেই…

কথা আর সুদীপ্তার শেষ করতে দিলেন না বীরেন্দ্রকিশোর। যেন স্প্রীংয়ের পুতুলের মতো চট করে শোয়া থেকে উঠে বসলেন। উঠে বসলেন যেন মৃত থেকে জীবন্ত মনুষ্যে। আর তখনি হেঁকে বললেন, বৌমা, তুমি আর কোনো দিন আসবে না আমার পা টিপতে। পা টিপবে আজ থেকে রাম। যাও, চলে যাও শীগগির…

সুদীপ্তা অপ্রস্তুত অবস্থায় পথ পেল না বেরিয়ে যেতে। শেষকালে সুদীপ্তারও এ-হাল হল !

তের

দিন চারেক অপেক্ষা করা হল। ছেলেকে দেখতেও এলেন জন-দুই ভদ্রলোক কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে, যার সঙ্গে সম্পর্ক, সে-ই অসম্পৃক্ত। সে-ই নিরুদ্দেশ।

টেলিগ্রাম করেছিলেন ছেলেকে বীরেন্দ্রকিশোর। জরুরী টেলিগ্রাম।—তার কলেজের হোস্টেলের ঠিকানায়···এই মুহূর্তে চলে এস। কিন্তু তাতেও ফল হল না। না এল ছেলে, না ছেলের চিঠি। একেবারে বাপের মুখের উপর—নাকের উপর তীব্র কশাঘাত। বহ্নিবৎ বদ্ধমুষ্ঠির বজ্রনিক্ষেপ।

বীরেন্দ্রকিশোর বনে থাকলে না জানি কী কাণ্ডই করতেন। সিংহ হলে না জানি কী সংগ্রাম-ই ডেকে আনতেন! সন্ত্রাসবাদী হলে না জানি কী ত্রাসেরই না সৃষ্টি করতেন! কিন্তু যেহেতু তিনি বড় বেশী কথা বলেন না, আর বাচাল মনুষ্যসমাজে তাঁকে বড় বেশী বাস করতে হয়—সেই জন্যই মূর্তিটা তাঁর দাঁড়ালো আঁচে সেকা হাঁড়ির মতো। মুখ হল রক্তাক্ত কিন্তু রক্তাধিক্যের চাপে নয়। গুম্ফ্ হল ছুঁচালো কিন্তু ছুঁচের কসরতে নয়। দাঁতের উপর কবাট পড়লো দাঁতের কিন্তু সে ক্রিমিদংশনে নয়।

বীরেন্দ্রকিশোর ভীষণ, ভয়াল হয়ে উঠলেন। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন রুদ্ধশ্বাস আগ্নেয়গিরির মতো। আর সেই অবস্থাতেই অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন তিনি মুখে ঈষৎ হাসি টেনে এনে।

গাম্ভীর্য যাঁর অপরূপ—হাসিও তাঁর অপূর্ব।

অতিথিরা প্রথমে কিছুই বুঝলেন না। উন্মোচন করতে পারলেন না রহস্যের উপক্রমণিকা। চেহারায়ও যেমন তাঁরা দু'জনে দুটি পর্বত, চায়ের চেয়েও প্রিয় হচ্ছে তেমনি তাঁদের সরবৎ। চা খায় কারা? তুমি আমি চা খাই। ওঁরা অত বোকা নন যে চা খেয়ে চেহারাটাকে দুদিনে পাকতেড়ে করে তুলবেন। পিপাসা পায়—প্রচুর দুধ খাও, খিদে পায়—খুপসুরত সন্দেশের শ্রাদ্ধ করো। চা? আরে ছোঃ। চা খায় কেরাণী, চা খায় মুহুরী, চা খায় চামচিকে। চা খায় তারাই, যা পায় যারা তাই খায়। চা তাঁরা কেউ ছুঁলেন না। চায়ের পাট তাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় নেই। মদ আছে, মহুয়া আছে, চাই কী ভাঙও আছে কিন্তু চা নেই।

থাকেন পশ্চিমে। পশ্চিমা গাভীর একটা সুনাম আছে শোনা যায়। কিন্তু পশ্চিমা মেয়ের? তার-ই বা কম কী? খাঁটি গমকে যারা দুর্দম হজম করে যেতে পারে আর পশ্চিমা গাভীর দুধ, তাদের দেহের বাড়বাড়ন্ত অবস্থাকে কে অস্বীকার করবে? বাংলা দেশের চারটে মেয়ের ব্লাউজ ওখানকার একটা মেয়ের বুকে আঁটলে হয়।

এই রকম একটি মেয়েরই খোঁজ পেয়ে সম্বন্ধ করতে এগিয়ে ছিলেন বীরেন্দ্রকিশোর। যে মেয়ে বাংলা দেশে এলেও রোগা হতে হতে অন্ততঃ বাঙ্গালী মেয়ের মতো হবে না। অন্ততঃ দেহের খাঁচাটা একটু বড় থাকবে শেষ পর্যন্ত। সেই মেয়েকেই

বৌ করে তিনি দেশশুদ্ধ লোককে অবাক করে দেবেন এই ইচ্ছাই ছিল। আর, আর একটা কথা ভুলে যাও কেন? টাকা দেবে কে অমন—মেয়ের বিয়েতে? বড় ছেলের বিয়েতে কী পেয়েছেন তিনি? ছোট ছেলের বিয়েতে তো সেটা উশুল করা উচিত। তাই ইচ্ছাটা ভদ্রলোকদের অনুকূলে থাকলেও অবস্থাটা প্রতিকূল দেখে তিনি বেশ বিচলিত হতে লাগলেন ভিতর ভিতর।

তবুও ছেলে নেই দেখে তিনি খুব ঘাবড়ালেন না। ছেলেকে আবার দেখবার কী আছে? ছেলে কানা নয়, খোঁড়া নয়, কালা নয়, কৌপিনধারী নয়!

ভদ্রলোকদের তিনি অমাত্র যত্ন করলেন।···

সারাদিন ধরে পরিচর্যার অন্ত রইলো না। দেখালেন পুকুর, বড় বাগান, বড় ছেলের ডিসপেনসারি, নিজের বৈভব, নিজের বিচক্ষণতা, আরো কতো কী!

অবশেষে তাঁদের বিদায় দিতে গিয়ে হাতজোড় করে বীরেন্দ্রকিশোর বললেন, ছেলে গেছে জরুরী একটা তার পেয়ে বাইরে। আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন মৃত্যুশয্যায়। বোনটি বাঁচলে হয়! কী জানি, কী সংবাদ পাবো। তবু ভবিতব্য। ভবিতব্য থাকলে ঘটকালির দরকার করে না।

অতিথিরা পরম পরিতৃপ্ত, কি পরম ব্যথিত হয়ে বিদায় নিলেন কে জানে! আর তারপরই বীরেন্দ্রকিশোর বসলেন গম্ভীর হয়ে তাঁর ইজিচেয়ারে।

ভগবান জানেন তাঁর বোন আছে কিনা আর তিনিও ভাবলেন, একবার ভগবানকে দেখে নেবেন কিনা।

কিন্তু ভগবানকে তিনি জন্মজন্ম দেখলেও মহামায়ার মন প্রবোধ মানলো কৈ ?

মহামায়া ধনী-কন্যাকে বৌ করতে চান না। মহামায়া বর্তমানে একান্ত করে যা চান, সেটি হচ্ছে তাঁর ছেলেকে কোলে পেতে। ফিরে পেতে। দেশে-দেশে, যুগে যুগে ছেলেরা বড় হচ্ছে, ছেলেদের মতি পালটাচ্ছে, ছেলেদের দৃষ্টি বদলাচ্ছে, কৃষ্টি বদলাচ্ছে কিন্তু মা ? মায়ের পরিবর্তন কৈ ? মায়ের দু'খানি সরল ভীরু চোখ, প্রেয়সীর আয়ত আঁখির চেয়েও কতো চমৎকার ! কতো সুন্দর ! মহামায়া মা বলেই তাই কষ্ট পেতে লাগলেন। বাপ হওয়ার দায়িত্ব যতো নিদারুণই হোক, মা হওয়ার দায়িত্বের দাম—অনেক বেশী। তা ছাড়া যবে থেকে তিনি শুনেছেন ছেলের শরীর খারাপ তবে থেকেই মাথা চাড়া দিয়েছে তাঁর মনের মুকুরে খারাপ দৃশ্যগুলিই। ছেলে যদি কলকাতাতেই গিয়ে থাকে, বেঁচে আছে তো ?

সুদীপ্তাকে বললেন, বৌমা, আজই একখানা চিঠি লেখো। তোমার চিঠি পেলে সে জবাব দেবেই। বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি মা······

স্বপ্ন দেখতে তো আর পয়সা লাগে না। আর স্বপ্নের উপর এখনো কোম্পানীর করধার্য হয়নি। ভালো চিন্তা করো—ভালো স্বপ্ন ! খারাপ চিন্তা করো—খারাপ স্বপ্ন। একটা কিছু

দেখলেই হল। স্বপ্ন সত্য কী মিথ্যা—এ নিয়ে কখনো গবেষণা করেনি সুদীপ্তা। মাথা খোঁড়েনি মাটিতে। তবু, চিঠিই সে লিখলো প্রদীপকে :

ঠাকুরপো,

তোমার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তোমার এই না বলে চলে যাওয়াটাকে অন্তর্ধান বলবো না, বলবো পলায়ন। বলবো পৃষ্ঠপ্রদর্শন। যুদ্ধে হার-জিত আছেই। সেটা যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যুদ্ধ করতে নেমেই বোঝা সহজ। তার আগে নয়। তুমি যদি সত্যই কাপুরুষের মতো গা ঢাকা দিয়ে থাকো, গা ঢাকা দিয়েই বন্যার জলে ভেসে পড়—তাহলে কোথায় রইলো তোমার শিক্ষা ? তোমার স্বাবলম্বন ? তোমার সৎসাহস ? বৌদি হিসাবে তোমাকে উপদেশ দেব না। মেয়ে হিসাবে পুরুষকে পরশ-পাথরের সন্ধান দিতে চাই। অন্তুতঃ, একটি বারও তোমার মায়ের কথা মনে করো। তুমি শীঘ্র ফিরে এসো। অধিক আর কী বলবো ?

চিঠিখানা ফেলে দেবার পর থেকেই সুদীপ্তার মনটা যেন বার বার বলতে লাগলো, আসবে না, আসবে না জবাব এ-চিঠির। চিঠির ভাষাটা কী ভাল হয়েছে ? আর একটু নরম, আর একটু মোলায়েম করলেই বোধ হয় ভালো হত। এসব লেখবার কী দরকার ছিল সুদীপ্তার ? নিজের অধিকার ছাপিয়ে কোনো কিছু অধিকার করবার কল্পনা করাই পাপ। আর হলও হয় তো তাই।—

দিন পনেরো কেটে গেল। না এল প্রদীপ, না তার চিঠি।

আর বোধ হয় অপেক্ষা করা গেল না। একদিন চুপি চুপি গৌরীর বাড়ি থেকে এসেই সুদীপ্তা আর চিঠি না দিয়ে পারলো না প্রদীপকে।

খুলে এবার সে লিখতে বসলো তার শেষ চিঠি—

স্নেহের ঠাকুরপো—

তোমাকে একখানা চিঠি দিয়েছি সপ্তাহ দুই পূর্বে। কিন্তু কী কারণে জবাব এল না, জানি না। বাবা তোমার জন্য ভালো সম্বন্ধ এনেছিলেন। তোমাকে যথাসময়ে টেলিগ্রামও করেছিলেন। তারও জবাব—তোমার পক্ষ থেকে আসেনি। দু'জন ভদ্রলোক এসেছিলেন এখানে দেখতে। সবই দেখে গেছেন। শুধু দেখেননি তোমাকে। তোমার কী মত? ওইখানেই বিয়ে করবে, না গরিব গৌরীকে? গৌরীদের বাড়ি দু'দিন গিয়েছিলাম। প্রথমবার তার মাকে অসুস্থ দেখেছিলাম। যাতে সুস্থ হন, তার সামান্য ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। আর শুনলে তুমি খুশি হবে. তিনি এখন সুস্থই আছেন। কিন্তু শারীরিক সুস্থ থাকলেও মনের দিকে থেকে তিনি অবশ্যই অসুস্থ। কী কারণে—সেটা বোঝবার জ্ঞান তোমার হয়েছে। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করো, বলবো, মনে-প্রাণে আমি সাম্যবাদী। তোমাদের এই বিয়েতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।

তোমার দাদার এবং মায়েরও খুব বেশী আপত্তি নেই। এখন তোমার নিজের চেষ্টা আর পুরুষকার। এর বেশী আর

কী বলবো ? গৌরীর মাকে দেখে বুঝলাম, তিনি এবার অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। পঞ্চান্ন বছরের এক বুড়োর সঙ্গেই মনস্থ করেছেন তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে। উপায় কী ? কাঁহাতক আর পরের ছেলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা যায় ? এটা সহর নয়—গ্রাম। এখানে কোর্ট নেই।—সমাজ। কোর্ট নেই কিন্তু কুটনী আছে প্রচুর। যারা একটু শিক্ষিত, একটু শান্তিপ্রিয় তারা সকলেই বাসা বেঁধেছে সহরে। আর এখানে যারা আছে, যাদের গতি নেই, প্রগতি দেখে যারা পিছলে যায়, শক্তি নেই কোথাও নড়বার, তারাই পরনিন্দা আর পরচর্চ্চা নিয়ে নড়াচড়া করে। তারাই কুটনো কোটে—চরম কুৎসার। বাটনা বাটে —বীভৎস বচসার। তাই সময় থাকতে সাবধান হওয়াই স্বাধীনতা। সম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়ানোই শক্তিমত্ততা।

মা প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। তোমারই শোকে, তোমারই দুশ্চিন্তায়। আর কতোদিন আড়ালে থাকবে ? আড়াল দিয়ে তুমি পালাবে না, পালাবে অন্য জন। তোমার দুঃখের কথা, অভিমানের কথা আমাকে জানাও। আমি তোমার দিদির মতো। আমাকে বিশ্বাস করো। আমার কথার জবাব দাও।

আমার এ-চিঠিরও জবাব যদি না আসে, তুমি বুঝতে পারছো না, কী হবে, কী হতে পারে। আমি দেখছি, ঈশান কোণে পুঞ্জ-পুঞ্জ কালো মেঘের সঞ্চরণ। কালো মেঘ আলো করে গোলেও পড়তে পারে অথবা বাধাতে পারে বিপ্লব, অথবা সৃষ্টি

করতে পারে বহ্নি অথবা পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে সমাজ। নষ্ট করে দিতে পারে সংসার। অথবা ক্যারামবোর্ডের খুঁটির মতো ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে বন্ধন।

এখনো— তুমি কী দিবে না সাড়া ?

কিন্তু সাড়াই যদি সে দেবে—তবে সরলো কেন ? আর সরলোই যদি সে এখান থেকে, তবে সরল হতে বাধা কি ?

কিন্তু বাধা আছে। বন্ধন আছে। বেদনা আছে। এই সমস্তগুলো নিয়েই সংসার, সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রবাহ, নিত্য-নৈমিত্তিক উত্থান পতন। নিত্য-নিয়ত উন্মাদনা।

অবশেষে বীরেন্দ্রকিশোরকেও ছুটতে হল একদিন। ছুটতে হল গ্রাম ছেড়ে শহরে। ঘর ছেড়ে প্রদীপের হোস্টেলে।··· প্রদীপের খোঁজে।

হোস্টেল প্রায় খালি। খালি তো হবেই। ছুটিতে কে থাকবে ? খেলোয়াড় নেই অথচ তাস আছে। জকী নেই অথচ ঘোড়দৌড়। এ সেই অবস্থা। এ সেই আকাশ। নিচে যার আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই, এমন কি দুটো শ্যামল-তৃণাচ্ছাদিত তটভূমিরও অভাব ! শুধু রৌদ্র-বিদগ্ধ বালুকাবেলা। শুধু তৃষিত মরুপথতাপ। শুধু তেপান্তরের মাঠ।

প্রদীপের বিছানা থেকে বীরেন্দ্রকিশোর কুড়ুলেন দু'খানা খাম। আর, দু'খানাই তিনি রাগের মাথায়—ছিঁড়ে, চিঠি বার করে পড়লেন। আর পড়ে সুদীপ্তার সম্বন্ধে যেটুকু বা ভালো

ধারণা ছিল—তাও বদলে গেল। জ্বালা যখন আসে, কোনখান দিয়ে যে তার প্রবেশপথ আর কোথা দিয়ে যে তার নিষ্কাষন, তখন জ্বালা যে সয় তারও থাকে সেটা বুদ্ধির অতীত। বুদ্ধির অগোচর।

সেই অবস্থাই এল বীরেন্দ্রকিশোরের। আর হিতাহিতজ্ঞান দ্রুত লোপ পেতে লাগলো অচৈতন্য নেশাখোর মাতালের মতো তাঁর মাথা থেকে।

'তোমার কী মত? ওইখানেই বিয়ে করবে, না গরিব গৌরীকে?'

কথাটাকে তিনি কিছুতেই ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। এ রীতিমতো একটা ইনসাল্ট—একটা ইন্ধন ছাড়া আর কী হতে পারে? বীরেন্দ্রকিশোরের তাই যতো রাগ—গিয়ে পড়লো সুদীপ্তার উপর। তাঁর নিজের মেয়ে নেই। মেয়ে থাকলে তার শিক্ষা যে তিনি কী ভাবে দিতেন তা ঠিক কল্পনা করতে পারেন না। তাই বলে এক পরের মেয়েরও এই ঔদ্ধত্যকে আসকারা দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর সমস্ত রুচি, সমস্ত আভিজাত্যবোধ যেন একই সঙ্গে—একই সুরে বুটের আয়োয়াজ করলো। যেন একই সঙ্গে কাঁধে তুলে নিলো বিদ্রোহের বন্দুক। শাস্তির সঙ্গীন। শাস্তি চাই। এর সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে হবে একটা তুচ্ছ মেয়েকে। হোক সে ঘরের বৌ কিন্তু ঘরের বৌয়ের উচিত—ঘরেই থাকা। পরকে জাগানো নয়।

'তোমাদের এই বিয়েতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।'

ওরে বাপরে! মরে যাই আর কী!

বীরেন্দ্রকিশোরের দাঁতগুলো কিড়মিড় করে উঠলো। আজ বাদে কাল তিনিই যদি ফের সন্দীপের দিয়ে দেন—তবে? তবে কোথায় যাবে তাঁর কুললক্ষ্মী? কোথায় যাবে সুদীপ্তা? তাই—তাই করা হবে। কার সমর্থন বেশী, কার সমর্থন করবার সামর্থটা সর্ববাদিসম্মত তাই তিনি দেখাবেন তাঁর পুত্রবধূকে!

প্রদীপ যাক কিন্তু পুত্রবধূকেও যেতে হবে!

বাড়িতে ফিরলেন বীরেন্দ্রকিশোর কিন্তু পুত্রবধূকে আর সহ্য করতে পারলেন না।

মহামায়াকে ডেকে পরিষ্কার বললেন, ছেলের খোঁজ নিতে গেছলাম। কোথায় গেছে জানি না, কিন্তু একটা কথা তোমাদের জানাতে হবে। বৌমা যেন আমার সামনে না আসে। তার আমি মুখদর্শন করবো না!

চৌদ্দ

দুনিয়ায় সুন্দরী স্ত্রীর জয় সর্বত্র। শ্বশুর তাকে না মানুক, স্বামী মানবে। আর সে যতো অপরাধ-ই করুক, সুজন স্বামী তাকে সুচক্ষে দেখবেই।

সন্দীপ স্ত্রীর মুখ চেয়েই, ধরে নাও, বাঁচিয়ে তুললো ত্রিলোচনাকে। ত্রিলোচনা কেঁচে গেলেন না, বেঁচে উঠলেন এ-যাত্রায়। কিন্তু বেঁচে ওঠা এক জিনিস আর বাঁচার মতো বাঁচা—আর এক জিনিস। বাঁচার মতো তিনি কী বাঁচতে পারলেন ? না, বেঁচে সুখ পেলেন ? বয়স্থা কন্যা যাঁর কণ্ঠলগ্না —তাঁর বাঁচা কাকে বলে ? তিনি বাঁচতে চাইলেই বা সমাজ বাঁচতে তাঁকে দেবে কেন ? ইচ্ছা করলে তুমি মরতে পারো কিন্তু ইচ্ছা করলেই কী তুমি বাঁচতে পারো ? বাঁচো দেখি একবার !

গৌরখুড়ো হাতের আস্তিন না গুটিয়ে পারলেন না।

চোখ রাঙালেন ঃ দেখ উমাশংকর, স্ত্রীর কথা শুনো না। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। এ নৌকোও পাবে না, ও-নৌকোও পাবে না। এখনো সময় আছে। ভেবে দেখো। ভেবে দেখো। নদীর কূলে বাস—ভাবনা বারো মাস। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, ভাবার মতো তুমি এখনো ভাবছো না দেখে। আরে বাবা, এত দ্বিধা করবার এতে আছে কী ! মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে গাঁট থেকে

নগদ টাকা দিতে হয়। তুমি টাকা দিতে পারবে? পারবে না যখন, তখন আর দ্বিধার কী আছে? টাকা তুমি দেবে না কিন্তু টাকা পাবে। একি কম সৌভাগ্য তোমার?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে থেকে আর পারলেন না উমাশংকর। চোখ থেকে তাঁর, টপ করে ঝরে পড়লো দুটো অশ্রুবিন্দু।

দুটো অশ্রুবিন্দু পৃথিবীতে কিছুই নয়। কে বলে শোণিত-রাঙা বেদনা? এমন কতো অশ্রুর বান বয়ে গেছে জমিদারি কাছারীতে, বিচারহীন রাজদ্বারে, লোকালয়ের বাইরে—শ্মশানে, কচুয়া ধোলাইয়ের কসাইখানায়, কলিয়ারি আর নিষ্ঠুর কল-কারখানায়। চা বাগান আর চকবাজারে। দুটো অশ্রুবিন্দু পৃথিবীতে কিছুই নয়।

কিন্তু তবু যে এ—স্নেহময় বাপের। গরিব বাপের বুকের কথা সন্তান জানে। সন্তানের বুকের কথা গরিব বাপ জানে। বাপ বেঁচে আছে, তাই জানে, তাই জানায়। যার বাপ নেই, তার কেউ জানবারও নেই, জানাবারও নেই। হায়রে স্নেহ!

—কি হে। তুমি যে কেঁদে ফেললে দেখছি। একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন গৌরখুড়ো: তুমি তো আচ্ছা ইয়ে বটেক। কথা বলাও তো দেখছি ঝকমারি তোমার সঙ্গে।

—না, না, কাঁদিনি। ও—কিরকম পড়ে গেল।

সামলে নিলেন ত্বরিত উমাশংকর।

—তাই বলো। শুভ কাজে আবার কান্না আসে? আমিও যেমন!

গৌরখুড়ো এবার উমাশংকরের কানের কাছে মুখ আনলেন এগিয়ে: আরে ভাই, তুমি যে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছ, আমি কি বুঝি না? বুঝি। ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না, বুঝলে?

মুখখানার যে এমন একটা বিকট ভঙ্গি করতে পারে মানুষ, গৌরখুড়োকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। সেই ভঙ্গিরই নমুনা দেখিয়ে ফের কানে কানে সুরু করলেন তিনি—তাই জন্যেই বলছি, ওপথ তোমার নয়, ওপথ ভুল, ওপথে কাঁটা। ওগুড়ে বালি। ছেলে কোথায় আছে—জানো?

উমাশংকর কথা বললেন না। শুধু তাকালেন গৌর খুড়োর মুখের দিকে।

—ছেলেকে সরিয়ে দিয়েছে বাপ। বুঝলে? আসল কথাই তো তুমি জানো না। ছেলের সম্বন্ধ হয়েছে মস্ত বড়-লোকের বাড়িতে। বীরেন্দ্রকিশোর কি তোমার বাড়িতে ছেলের বিয়ে দেবেন, না আমার বাড়িতে? তিনি অত কাঁচা লোক নন হে। কাঁচা লোক নন।

গৌরখুড়ো চুপ করলেন। চুপ করবার মানেই হচ্ছে তাঁর—ফের দম নিয়ে কথা বলা। বললেনও তাই।—অত ভাবনা-চিন্তা কোরো না। তাহলে পাকা করে ফেলা যাক কথাটা। কি বলো! আর গিন্নীকেও বুঝিয়ে বোলো তুমি। এ সব কিছু নয়, কিছু নয়। সংসারটা মায়া। বুঝলে কিনা? যার সঙ্গে

যার ভবিতব্য—ও হবেই। তাই বলে তো আর হাঁ করে বসে থাকলে চলবে না।

—সত্যিই তো! এত বড় মেয়ে গলায় করে বেঁচে আছিস কি না? আমরা হলে তো মরে কোন কালে ভূত হয়ে যেতাম। ছ্যাঃ ছ্যাঃ!

দত্ত-গিন্নী একেবারে ঝেঁটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ত্রিলোচনার মুখের দিকে পর্যন্ত তাকালেন না আর ফিরে। লোককে তিরস্কার করবার সময় তিনি চোখ খুলে রাখেন না। যা বলবার—চোখ বুজেই বলে যান। তাতে, শ্রোতা দুঃখ পেল, কি খুশি হল, বয়েই গেল দত্ত-গিন্নীর।

বিকালে চাঁপার মাও একদিন বেড়াতে এল। ও অঞ্চলে পাড়াবেড়ানির দলের প্রতিযোগিতায় চাঁপার মা-ই প্রথম।

আসে ভিজে বিড়ালটির মতো। যাবার সময় যায় ঘট উলটে দিয়ে। তখন আর সে ভিজে বিড়াল নয়—বন-বিড়াল। ঘোরো মুরগি নয়—বন-মুরগি।

এসে বললে, তাই তো, তোদের খবর কিরে? এই যে বৌ, ভালো হয়ে গেছিস দেখছি। তা বেশ, তা বেশ।

ত্রিলোচন বললেন, বোসো না গো…

—বসবো? তা হলেই হয়েছে! এই একবার এসেছি, এতেই কতো কথা উঠবে, ফের বসা! হ্যাঁরে, ডাক্তার যে তোর চিকিচ্ছে করলে, ভিজিট নিয়েছে?

—না।

—না তো বললি বড় মুখ করে। কিন্তু ভাইটিকে কোথায় সরালো তা তো বললি না ? বলি, কতোদিন আর বড়লোকের মুখ চেয়ে বাঁচবি ? এদিকে মেয়ে যে বড় থেকে বুড়ি হয়ে দাঁড়ালো।

এই প্রকারের সব ইতর কথাবার্তা। গায়ে পড়ে এই ধরণের সব বিশ্রী গালাগালি।

কবে যে বাড়িতে আসা পাঁচজনের বন্ধ হবে—ত্রিলোচনা ভেবে পান না। মাথা খুঁড়ে তার মরতে ইচ্ছা করে।...

কিন্তু বাড়িতে আসা একদিন পাঁচজনের বন্ধ হল।

পাঁচজন ছেড়ে দু'জনও এল না।...

প্রথম অবস্থায় দেখা দিল ত্রিলোচনার জ্বর। গা হয়ে উঠলো আগুন। চোখ হল আরক্তিম। পিপাসা বাড়লো প্রচুর। তারপর গুটি গুটি কী সব বেরুতে লাগলো তাঁর হাতে, বুকে, পিঠে, পায়ে, দেহের সর্বত্র।

গৌরী আর স্থির থাকতে পারলো না। নিমজ্জমান ব্যক্তিরও অবলম্বন ভাসমান তৃণখণ্ড। গৌরীর অবলম্বন জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমাকেই সে ডাকতে ছুটলো। আর গিয়ে দেখে সামনে রণজিৎ....

রণজিৎ আর দুর্গা খানিক আগে এসেছে।

লাফিয়ে উঠলো রণজিৎ অমেয় আনন্দে।—আরে, এসো, এসো। তারপর, কেমন আছো ?

দুর্গাও বেরিয়ে এল ঘর থেকে মেয়ে কোলে করে। মেয়ে তার এক বছরের। আরো বছর দুয়েকের একটি ছেলে আছে। বিয়ে হলেই পুত্র-কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা। বাঙ্গালীর বাহাদুরী—শুধু কী বিয়েতে? পুত্রকন্যা সৃষ্টি করার ব্যাপারেও বৈকি।

রণজিৎ যেন গৌরীরই আশা-পথ চেয়ে বসেছিল এতক্ষণ। এতক্ষণ নয়—এতদিন। এতদিন নয়—এত মাস।

সকলকে ছাপিয়ে রণজিৎ প্রশংসমান, লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো গৌরীর দিকে। বললে, বোসো।

—বসবো না।

গৌরীর মুখখানি ছোট হয়ে গেছে ভাবনায়, হতাশায়।

গৌরী বললে, বসবো না, জ্যাঠাইমাকে একবার ডাকতে এসেছি, মায়ের ভারী অসুখ।

—কী অসুখ? রণজিৎ ফের জিজ্ঞেস করলো।

জবাব দিল না গৌরী।

গৌরী জ্যাঠাইমার কাছেই যাচ্ছিল।—

জ্যাঠাইমা তখন দুর্গার আনা মিষ্টান্ন বিতরণ করছিলেন সযত্নে নিজের ছেলেদের ভিতর। গৌরীকে দেখে টপ করে লুকিয়ে ফেললেন খাবারের ঠোঙ্গাটা।

গৌরী কিন্তু তা চেয়েও দেখলো না। তার মায়ের যে অসুখ, এইটেই তার কাছে তখন বড় সত্য হয়ে উঠেছে। বড়—নির্মম।

গৌরী ডাকলো—জ্যাঠাইমা।

—কী রে ?

—মা কেমন কচ্ছে। তাঁর ভারী অসুখ, একবার আসবেন ?

—এখন আমার সময় কৈ ? আচ্ছা, যাব'খন, যা....

জ্যাঠাইমা এসেছিলেন বটে এক ফাঁকে, কিন্তু তাঁর সেই আসাই যে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের গায়ে জলবিছুটির বিলেপন—তা কে জানতো !

জ্যাঠাইমা ফিরেও আর এলেন না। দুর্গাকেও সাবধান করে দিলেন ঘরে এসে। যেন খবরদার সে বা তার ছেলেমেয়ে ওখানে না যায়। অসুখ তো নয়—মায়ের দয়া। সাংঘাতিক, সর্বনেশে অসুখ—বসন্ত। বাঁচবার আশা নেই।

বেলাবেলি সকলকে খাইয়ে দিলেন। কী জানি, যদি হাঁড়ি ফেলতে হয় ! একটা অদ্ভুত, থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগলো দুর্গাদের বাড়ি। যতো না গৌরীদের—তার চেয়েও বেশী দুর্গাদের।

গৌরী একা যে তার মাকে নিয়ে কী করবে, কী করতে পারে—ভেবেই পেল না। মা বাঁচুক, সে মরুক। তাতে তার দুঃখ ছিল না। কিন্তু ঠাকুর। তুমি এমন নির্দয়, এমন নিষ্ঠুর ! পথের ধারে যারা রয়েছে, তাদেরই পথে ভাসাতে চাও। কেঁদে কেঁদেই সে সারা হতে লাগলো। কেঁদে কেঁদেই সে মাছি তাড়াতে লাগলো। কেঁদে কেঁদেই সে মুমূর্ষু মায়ের শয্যাপ্রান্তে লুটিয়ে তার মাকে হাওয়া করতে লাগলো। তার মায়ের ময়লা

পরিষ্কার করে সে ফেলে এল বাইরে। অনেক রাত্রে পুকুরে এল ডুব দিয়ে।

মেয়ে যতো কাঁদে, উমাশংকর তারও বেশী অস্থির হন।

ত্রিলোচনার আয়ু যতো শেষ হয়ে আসতে থাকে, উমাশংকরের বুকও তত ফেটে যায়।···

একবার কী জন্য কে জানে, রণজিৎ এ-বাড়িতে ছুটে ঢুকে পড়েছিল। ঢুকে পড়েছিল দড়িছেঁড়া গরুর মতো। আর পিছন পিছন দুর্গার সে কী সতর্কতা! সে কী গোয়েন্দাগিরি!

—ওগো শুনছো? শুনতে পাচ্ছো না? বলি, ডাকছি, শুনতে পাচ্ছো না?

রণজিৎ ধরা পড়ে পালিয়ে যেতে পথ পায়নি!

গৌরখুড়োর ডাকে উমাশংকরকে সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে আসতে হল।···

গৌরখুড়ো বললেন, কী হল? দিন স্থিরের দেরি কতো?

—তুমি ভাবছো দিনস্থিরের কথা, আমি মরছি নিজের জ্বালায়! আমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ভাই!

উমাশংকর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

—তা, তা, বললেই তো হয়! কী জ্বালারে বাবা!

গৌরখুড়ো অবুঝের মতো নিমেষে বেঁকে বসলেন আর যেন প্রচণ্ড রাগ দেখিয়েই হন হন করে চলে গেলেন।

মানুষের যে বিপদ আছে—আপদ আছে—এটুকু বোঝবার

লোকেরও আজ একান্ত অভাব! এই কথা ভেবেও কম দুঃখ পেলেন না উমাশংকর!

উমাশংকরের সে-ক্ষমতা, সে-প্রবৃত্তি আর রইলো না, যে ডেকে ফের ভাব করেন তিনি গৌরখুড়োর সঙ্গে!

রাত্রি দু'টো দশ মিনিটে ত্রিলোচনা ক্রন্দনরত স্বামী আর মেয়েকে ভাসিয়ে চলে গেলেন দূরে। দূরে—দৃষ্টির অগোচরে। চিন্তার—ভাবনার অলোল অন্তরীক্ষে। সকল সীমানার শেষ সীমানায়। মায়া কাটিয়ে ইহজীবনের। ইহজীবনের—একান্ত করে আপনার জনেরও!

যাবার সময় মেয়েকে একটা কথা বলবারও ক্ষমতা ছিল না তাঁর!

পনের

কী কষ্টে যে দাহ করা হল, ভগবান জানেন!

অমন পূজারী ব্রাহ্মণের স্ত্রী—জীবনেও তিনি পূজা পেলেন না, মৃত্যুতেও তিনি অপূজনীয়াই রয়ে গেলেন! এল না কোনো ব্রাহ্মণসন্তান শব নিয়ে যেতে। ব্রাহ্মণের দর এখানে অনেক। ক্ষীর খাবার ব্রাহ্মণের অভাব নেই। ছানার জল খাবার ব্রাহ্মণেরই অভাব! তা ছাড়া—এ-অসুখে কে আসবে প্রাণ দিতে? এক এক করে ডাকতে যাওয়া হল। কারো স্ত্রী সন্তানবতী, কারো হাতে ঠাকুরের মাদুলী, কারো বা অসুখ! কেউ নেই—কেউ নেই! জীবনেও যে নিঃসঙ্গ, মৃত্যুতেও সে নিভৃত! গৌরী একা চীৎকার করে কাঁদলে কী হবে? মা তুনিয়ায় সকলেরই থাকে। সকলেরই যায়। এত কাঁদলে চলবে কেন?

ব্রাহ্মণ এল না কিন্তু শূদ্রের দল বয়ে নিয়ে গেল শব। সমাজ এতক্ষণ ধরে চুপটি মেরে ওৎ পেতে ছিল।

শবও গেল—তারাও সাড়া দিল!

চোখে-চোখে, মুখে-মুখে ইসারার ইঙ্গিত চলে গেল—জলতরঙ্গের বাজনার মতো। শর-বনে বাদলের হাওয়ার মতো।

কে খায় ওর বাড়ি—দেখবো! সতর্ক, সচেতন হয়ে উঠলো সমাজ। সনাতন, সমাজধর্মী মহাপ্রাণগুলি!

ছটফট করে উঠলো রণজিৎ।

অনেক রাত্রি—তবু, আর সে শুয়ে থাকতে পারছে না। দুর্গাকে ডাকলো—ঘুমুচ্ছো নাকি?

দুর্গার পক্ষ থেকে সাড়া এল না।

রণজিৎ—নিশ্চিন্ত, নির্ভীক মনে বেরিয়ে এল ঘরের দরজা খুলে। গৌরীর দুঃখে না হোক, শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার সুযোগটা হারালে আর দুঃখের সীমা থাকবে না।

রণজিৎ নেমে পড়েছিল সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে।

দুর্গার সগর্জন স্বর ভেসে এল ঃ কোথা যাচ্ছো?

—কী আপদ। যেন চমকে উঠলো রণজিৎ—তুমি না ঘুমুচ্ছিলে?

রণজিতের মাথায় কে যেন বাড়ি মারলো।

হাঁড়ি মারবার আগেই যেন বিড়ালের হাড়ির হাল! রণজিৎ —বিরক্ত, ব্যস্ত হয়ে গুটি গুটি এগিয়ে এল ফের দুর্গার কাছেই।

—ঘুমুচ্ছিলাম বটেই তো! তোমার মতো লম্পট স্বামীর পাল্লায় পড়লে কোনো স্ত্রীর ঘুম আসে?

দুর্গা মুখরা, মায়াহীন হয়েই জবাব দিল।

আর তাইতেই আরো বেশী চটে উঠলো রণজিৎ।

—আমি না হয় লম্পট কিন্তু তুমি? তুমি কী?

—আমি কি, বলো না?

—তুমি যা, তা মুখে আনতেও পাপ হয়। তুমি হচ্ছো একটি মস্ত বড় ছিনাল।

—কী, আমি ছিনাল? মুখ সামলে কথা বলো বলছি। মনে রেখো, এটা তোমার বাবার বাড়ি নয়, এটা আমার—আমাদের বাবার বাড়ি। যতো কিছু অত্যাচার করেছ সেখানে, সয়েছি। এখানে নয়। এখানে টু-শব্দটি করেছ কী, রক্ষে রাখবো না।

যেন দাবানলের মতো জ্বলে উঠলো দুর্গা। এই ক'বছরের ভিতর-ই তার শরীর হয়েছে জীর্ণ, গলা খনখনে···

—ওরে আমার সতীরে। যে না ঘুমিয়ে, ঘুমোবার ভাণ করে পড়ে থাকে—তার কাছে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে, নয়? যা যাঃ। তোর বাবার বাড়িতেই তুই থাকগে যা, আমাকে বাবার বাড়ি দেখাসনি। মেয়েদের তেজ কী করে ভাঙতে হয়, আমি জানি। কালই তোর মজা আমি দেখাচ্ছি।

রাজযোটক মিলের পরিণতিটা এই ক'বছরের ভিতর-ই যা দাঁড়িয়েছে তাতে এখনো খুনোখুনি কেন হয়নি, সেইটেই আশ্চর্য।

—মজা আমিও দেখাতে কম পারি না।

দুর্গা চুপ মেরেও চুপ মারতে চায় না। বলে, কালই আমি বলে দেবো, তুমি চাকরি খুইয়ে এখানে এসে আশ্রয় গেড়েছ। তখন দেখবে, তোমার খাতির হবে কেমন!

—তোর মতো বৌ যার বরাতে জুটেছে, চাকরি কেন, প্রাণ-খোয়ানোও তার আশ্চর্য নয়।

—সে তো তাই দেখাচ্ছো তুমি। দুটো ছেলে মেয়ে—তবুও পরের মেয়ের ওপর লোভ গেল না! ছিঃ, গলায় তোমার দড়ি জোটে না।

—না, দড়ি তোর কাছ থেকে কিনতে হবে আমায়। পরের মেয়ের ওপর একশোবার লোভ করবো। লোভ করবো না—কার ভয়ে শুনি? একটা অসভ্য জানোয়ারকে নিয়ে চিরকাল—চিরদিন বয়ে বেড়াতে হবে? কেন, চাকরি গেছে বলে কী আর চাকরি কখনো হবে না! দেখি তো, কে আমাকে রুখতে পারে!

আর সেই দেখাতেই কিনা কে জানে, গ্রামে যা ব্যাপার হল—অদ্ভুত, অভূতপূর্ব।

এমনটা যে ঘটতে পারে, এমন যে কখনো কেউ দেখেছে, শুনেছে—বিশ্বাস করাও কঠিন। ভালো লোকের পক্ষে বিশ্বাস করাও বিপদ। বিশ্বাস করাও আত্মপ্রবঞ্চনা।

ত্রিলোচনার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে একদিন রাতে গৌরী গেল পুকুর ঘাটে। পুকুর ঘাটে জল আনতে।···

এক বালতি জল নিয়ে সে তখন সবেমাত্র ফিরছে, ফিরছে শোকসন্তপ্ত হৃদয় নিয়ে, এমন সময় কে যেন তাকে ডাকলো। ডাকলো তো ডাকলো, এমন কতো রাত্রিতেই তো সে জল নিয়ে ফেরে আর কে কাকে ডাকে তার ঠিক কি! ভ্রূক্ষেপ করলো না গৌরী। মনের ভুলই হবে! নইলে কাউকে তো সে নিশ্চয় দেখতে পেত সামনে।

কিন্তু যে ডাকলো—সামনে না থাকলেও সে পিছনে ছিল। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে অসংখ্য তারা কিন্তু চাঁদ নেই।

পাশেই একটা ঝোপ। বৃক্ষ আর লতাগুল্মে সে-ঝোপ আরো অন্ধকার। একটা মানুষ উঠে এসে পিছন থেকে চেপে ধরলো গৌরীর নধর, সুকোমল একখানি হাত। ডাকলো—গৌরী!

গলাটা চেনা। চেহারাটাও অচেনা নয়…

গৌরী বিস্মিত, বিহ্বল কণ্ঠে বললে, একি, আপনি? আপনি এখানে কেন?

—আমি? আমি মরতে এসেছি। আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও গৌরী!

—আপনাকে এখানে থাকতে কে বলেছে? হাত ছাড়ুন আগে…

—এখানে থাকতে আমি চাইনি, আমি যাবো, আমি যাবো। কিন্তু হাত তোমার আমি ছাড়বো না। তোমার হাত বড় নরম, বড় সুন্দর…তোমাকে আমার চাই-ই।

এতক্ষণে গৌরী ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারলো আর বুঝতে পারলো বলেই এক ঝটকা মেরে সে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল ঐ অসভ্য লোকটার হাত থেকে। বালতির জল—দোলা লেগে অনেকখানি পড়ে গেল, অনেক গড়িয়ে গেল মাটিতে, ঘাসের উপর। আর গৌরী তীব্র কণ্ঠে ভৎর্সনা করলো মানুষটাকে, রসিকতা করবার, কাব্য করবার আপনি সময় পেলেন না? আপনার পক্ষে যা ঠাট্টা—আমার পক্ষে যে তা মৃত্যুর সামিল, এটুকুও কী আপনাকে শিখিয়ে দিতে হবে? না, আপনার

শ্বশুরকুলের পক্ষ থেকে আপনি এসেছেন নূতন করে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে? না, আমাদের দুর্দিন বুঝে—দেখাবার লোভ সম্বরণ করতে পাচ্ছেন না আপনার দানবিকতা?

—আমাকে বিশ্বাস করো গৌরী, তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। আমার দ্বারা তোমাদের কোনো বিপদই হবে না। আমি জানিনা, কী পাপে বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হল। হল না তোমার মতো একটি মেয়ের সঙ্গে—যে গরিব, অথচ সুন্দরী, সুশ্রী অথচ স্নেহশীলা। তোমার দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমাকে বিশ্বাস করো—তোমাকে পেলে যে বুকে করে রাখতাম। তোমাকে পেলে যে রাণী করতাম।

—আগে নিজে রাজা হোন, তারপর স্ত্রীকে রাণী করবেন। আমার কাছে আর পাগলামী করতে হবে না।

গৌরী অন্ধকারেই এগুতে গেল। কিন্তু পারলো না।

তার আঁচলটা যেন চেপে ধরেছে কে সজোরে।

চেপেই ধরেছিল বটে। তাই সে এগুতে গিয়েও পড়ে গেল। তার কোমরের কসি আলগা হয়ে গেল। বালতিও সশব্দে পড়ে গেল। আর সে কেঁদে ফেললো শাড়ী সামলাতে গিয়ে।

লোকটার মনে যেন এতটুকু দয়া নেই। এতটুকু মায়া নেই। হোটেলের মুরগী আর কুমারী মেয়েলোক—দুটোই যেন তার কাছে সমান। দুটোই যেন সম্পূর্ণ সম্ভোগের সামগ্রী।...

নিবিড়, নির্মম, হিংস্র সরীসৃপের মতো সে জড়িয়ে ধরতে

পারলো নিমেষে—শিরায়-শিরায় শরীরে-শরীরে আষ্টে-পৃষ্ঠে গৌরীকে, আর পাছে সে চীৎকার করে, পাছে কেঁদে ওঠে এজন্যও সাবধান হল। সাবধান হল, মানে কোঁচার খুটটা গৌরীর মুখের মধ্যে পুরে দিল।

গৌরী চেঁচালো না কিন্তু হাত পা ছুঁড়তে লাগলো। কাঁদলো না কিন্তু কামড়ে দিল তার নাকে। আর এমন করেই কামড়ালো যাতে লোকটা পথ পেল না তাকে ছেড়ে দিতে, অভুক্ত অবস্থায় তাকে ফেলে দিতে।

পৃথিবীর এতটুকু নিশ্বাসও ইথারে গিয়ে আন্দোলিত হয়। ইথারে গিয়ে আওয়াজ তোলে। তা, হাত-পা ছোঁড়ার শব্দ তো বড় বেশী সাঙ্কেতিক, ব্যাকুল চীৎকার তো বড় বেশী বাঙময়।

সট করে কে যেন সেখানে টর্চের আলো ফেললো। আর এই আলোটাকেই মনে হল যেন মৃত্যু। মৃত্যুর মতোই উলঙ্গ, মৃত্যুর মতোই চিত্তহারী। মৃত্যুর মতোই মোহনিয়া।

আর আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে লীন হয়ে গেল একটা সরীসৃপের মতো, একটা শ্বাপদের মতো ঐ গোটা সম্পূর্ণ মানুষটা।

ষোল

সকাল হতে আর সবুর সইলো না।

নির্জীব গ্রামখানি অনেক সাধনায়, অনেক সুকৃতিতে পেয়ে গেল নবজীবন। ওদের জীবনের মহানন্দ। জীবনের বিপুল বৈচিত্র্য।

কতো যাত্রা হয়েছে গ্রামে, কতো চাঁচর হয়েচে—রাস হয়েছে, পূজা হয়েছে বছরে বছরে—সে সব তো একঘেয়ে। সে সব তো পুরাতনের পর্যায়। যার টাকা আছে সে দেখিয়েছে, যার টাকা নেই, সে দেখেছে। যার শেখাবার ক্ষমতা আছে সে শিখিয়েছে। যার শেখাবার ক্ষমতা নেই সে শিখেছে।

কিন্তু আজকের এই উৎসব স্বতন্ত্র শ্রীক্ষেত্রের। সম্পূর্ণ সার্বজনীন, সম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ। এর মধ্যে এতটুকু নেই জটিলতা, এর মধ্যে এতটুকু নেই ষড়যন্ত্র। একটা নাবালকও গ্রহণ করবে এর নবনীটুকু। একটা কঠিন হৃদয়ও মেনে নেবে এর কৌতূকরস। আর সে-রসের একমাত্র পরিবেশক হয়েছেন গৌরখুড়ো।

গৌরখুড়ো হেঁটে আর কতো পারবেন? হেঁটে আর কতোদূর চাউর করতে পারবেন এই জবর-খবর? তাই বাধ্য হয়েছেন তাঁর ভাইপো মানকের কাছে একটা সাইকেল চেয়ে নিতে। মানকেও খবরটার গুরুত্ব স্বীকার করে বাধ্য হয়েছে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে।

মানকের আছে মুদীখানার দোকান। এই সাইকেলটিই তার ভরসা— নিকট গঞ্জ থেকে মাল গস্ত করবার। তবু সে আজ দিয়েছে তার শেষ অস্ত্র— প্রিয়তম কাকার হাতে তুলে। আর গৌর খুড়ো সেই সাইকেল চেপে ছুটে ছুটে চলেছেন পাড়া থেকে বেপাড়ায়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—সমাজরক্ষার শপথ বহন করে। সাইকেল তাকে বহন করছে আর তিনি বহন করছেন সনাতন সত্যব্রতকে। সনাতন হিন্দু-ধর্মকে :

—এর একটা বিহিত করতেই হবে। গৌর খুড়ো মনে-মনে বললেন, তোমার বড় তেজ হয়েছে শালা, অমন সম্বন্ধ তুমি অগ্রাহ্য করলে ? তবে দেখো, এই শর্মা তোমার কী করে !

লোকে হৈ হৈ করে উঠলো ঃ একি বিশ্বাস্য ! আরে, এ যে শোনাও পাপ ! তাই আবার হয় নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই হয়। তাই হয়েছে ! গৌর খুড়ো বুক চিতিয়ে ধরলেন, এ শুধু আমার একার দেখা নয়, আমার সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং বীরেন্দ্রকিশোরবাবু। আমি তো ধার্মিক লোক, অত শত কী বুঝি ? না, সব দিকে আমি নজর দিতে পারি ? সে-সময়ই বা কোথায় আমার ?. সে-সম্বলই বা কোথায় ? কিন্তু বীরেন্দ্রকিশোরবাবু বিষয়ী লোক মশায় ! তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। তিনি নিজে ডেকে আমায় দেখালেন আর ক্লিক করে টর্চের চাবি টিপলেন।

—কী দেখলেন ? একজন প্রশ্ন করলো।

—আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা···সে বলা যায় না !

বলা—যায় না বটে, কিন্তু ইচ্ছা থাকলে সবই বলা যায়। ইচ্ছা গৌরখুড়োর পুরোপুরিই ছিল। আর লোককে জানাতেও তিনি শেষ পর্যন্ত কাতর ছিলেন না।

কিন্তু এসব খবরের মজা এই, রসিক লোকে যেটুকু শোনে, তার চারগুণ চাউর করে। চারগুণ করে প্রচার না করলে পরহিতব্রতে বোধ হয় তৃপ্তি আসে না। আর যা পরহিতব্রত—নিরবধিকাল আর বিপুলা পৃথিবীর উচ্চাবচ কুৎসা রটনাকারীদেরই তাই পরম সংক্রাম। পরম পরিহাস।

বেলা আটটার ভিতরই সমস্ত গ্রাম জেনে গেল, সমস্ত গ্রাম শুনে নিলো, উমাশংকরের আইবুড়ো মেয়ের এই কীর্তিকলাপ। কিন্তু যার সঙ্গে এই কীর্তিকলাপ বিজড়িত, যিনি নায়ক—তার নামটা আর কেউ জানলো না। ফলে, যার যা ইচ্ছা—সে তাই জল্পনা করতে লাগলো। স্থানে স্থানে জটলা বসলো···বাড়ি বাড়ি রসের বাড়াবাড়ি সুরু হল। কেউ বললে, যে-লোকটার সঙ্গে গৌরী ছিল সে একটা মুসলমান, কেউ বললে সাঁওতাল। কেউ বললে, চল্ না জিজ্ঞেস করে আসি ছুঁড়িকে গিয়ে, তোর উপপতিটা কোন্ ছোঁড়া! ছি ছি, এখনো অশৌচ কাটলো না, আর এর মধ্যেই তোর এই ছিল মনে!

রণজিৎ তো ঘটনার আগেই কলকাতা চলে গেছে।

শ্যামাশংকর বললেন, আহা, সে না থেকে ভালোই করেছে। বেচারা দু'দিনের জন্যে এসেছিল···এসব শুনলে কী ভাবতো বলো দেখি?

শ্যামাশংকরের স্ত্রী বললেন, ভাবতো না ? ছেড়ে দিত ? এটা কী ভদ্রলোকের জায়গা ? ঘেন্নায় কোথায় যাই বলো দেখি গা !

—কোথ্থাও যেতে হবে না তোমায়। আপাততঃ এক বাটি গরম দুধ আনো দিকিনি গিন্নী !

—তা আনছি। কিন্তু তুমি বাপু বড় দেখে পাঁচিল তুলে দাও, আমি আর ওদের মুখদর্শন করতে চাই না।

শ্যামাশংকর সান্ত্বনা দেন : স্থির হও গিন্নী, স্থির হও। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পাঁচিল আর তুলতে হবে না। ওদের সমস্ত জায়গাটাই আমার হবে। আমিই নেবো। তখন পাঁচিল আর মাঝখানে তুলতে হবে না। পাঁচিল—বাড়ির চারিধারে তুলবো। হাঃ হাঃ···

গাঁয়ের মেয়েরা হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ে গৌরীদের বাড়ি। দেখতে আসে গৌরীর চেহারাটা।

শোক করা চুলোয় যাক—এখন গৌরী দেখা দিক ! ওদের কৌতূহল মেটাক !

গৌরীরও যেমন অদৃষ্ট, উমাশংকরেরও তেমনি অসহায়তা !

গৌরী যেখানে নির্ভীক, উমাশংকর সেখানে নির্জীব !

উমাশংকর গরিব অতএব তাঁর আর কিছু বলবার রইলো না। যাঁরা বড়লোক, যাঁরা সমাজপতি—তারাই সমাজ ডাকলেন।

যেমন গ্রাম, তার তেমনি সমাজ !

আর এতদিন পরে বীরেন্দ্রকিশোর তাঁর বিপুল বীর্যবত্তার পরিচয় দিলেন সমাজে দাঁড়িয়ে। সমাজের শীর্ষস্থানে তাঁর শির উঁচু করে। বহুদিন ধরে তিনি দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চিন্তা করেছেন, মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর বদ্ধমুষ্টি ঠুকে বলেছেন, এর প্রতিকার করবো, এর প্রতিকার করবো, এর প্রতিকার করবো। তখন তিনি সুযোগ পাননি কিন্তু আজ পেয়েছেন। আর, কী আশ্চর্য, পড়তো পড়—তাঁরই চোখে! ঝোপের মধ্যে একি অনাছিষ্টি কাণ্ড।

তিনি কতোদিন উমাশংকরকে সাবধান করেছেন: দেখ উমাশংকর এ কিন্তু ভালো হচ্ছে না। মেয়ের বিয়ে দাও, যেখানে জোটে সেখানেই দিয়ে দাও। তখন উমাশংকর বিনয়ের হাসি হেসেছিল। হাসি হেসেছিল কী এই কাণ্ড করবার জন্য? না তার গোপাল ছেলেকে ফাঁসাবার জন্য?

—ওর ইয়ার্কী আমি ভাঙছি! আমার ছেলে যাক ক্ষতি নেই, তবু ওকেও যেতে হবে। যেতে হবে ওই কুলটা কন্যাকে সঙ্গে করে।

বীরেন্দ্রকিশোর আপন মনেই গর্জন করলেন।

গোল হয়ে সমাজপতিরা বসলেন।...

রায় দিলেন, উমাশংকরকে এক ঘরে করা হোক।

কিন্তু বীরেন্দ্রকিশোর বললেন, শুধু একঘরে করলেও ওর শাস্তি হবে না, ওকে গ্রাম থেকে বার করে দিতে হবে।

গৌর খুড়ো বললেন, সে তো ভালো প্রস্তাবই। তবে

কিনা আমি বলছিলাম, গৌরী মানে ওর মেয়েকে ও যদি ছাড়তে পারে তাহলে না হয় বিবেচনা করা যাক!

—কিন্তু গৌরী কোথায় যাবে? একজন টিকিওলা আর না বলে পারলেন না।

—গৌরী কোথায় যাবে? জ্বলে উঠলো চোখ গৌরখুড়োর, কেন, কুলটারা যেখানে যায়···

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা! শ্যামাশংকরও সায় দিলেন। নিজের ভাই হাজার হোক তো!

কথা বললেন না শুধু উমাশংকর।···

চোদ্দ বছর ধরে যে মেয়েকে নিয়ে তিনি ঘর করছেন, যার নাড়ি-নক্ষত্র তাঁর নখ-দর্পণে—তাকে ত্যাগ করবেন তিনি এত সহজে? পারতেন—যদি পশু হতেন! আজ মেয়ের মা নেই। আজ তিনিই তার বাবা, তিনিই তার মা; তাই যেন বেশী দরদ, বেশী ভালোবাসা দিয়ে তিনি মেয়েকে উপলব্ধি করলেন। ধর্ম যাক—সেও ভি আচ্ছা তবু অধর্ম তিনি করতে পারবেন না। ঈশ্বরের ধর্মের কাছে—বিবেকের তাড়নার অতিরেকের কাছে এই তুচ্ছ সমাজ বড় হবে? তাই তিনি মেনে নেবেন? অসম্ভব!

গভীর রাত্রি। সহরের নয়—পল্লীর।

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে আগাছার আশে-পাশে। দেওয়ালের

ফাঁকে ফাঁকে। কতো নিশাচর, কতো হিংস্র জন্তুই না এখন আহার অন্বেষণে চরতে বেরিয়েছে! তারা নিশাচর, তারা হিংস্র তবু বোধ হয় মানুষের মতো নয়। ধানের শীষের মতো একবার আকাশের অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে চাইলেন উমাশংকর। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। ফেললেন না—ছড়িয়ে দিলেন মেঘে মেঘে, ইথারে ইথারে, আকাশে বাতাসে। প্রণাম করলেন গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে। শুধু গৃহদেবতা নয়—গ্রাম দেবতারও উদ্দেশ্যে বৈ কি! তারপর ঘুমন্ত মেয়েকে ডেকে জাগালেন।

গৌরী জাগলো। জাগালো কিন্তু তখনো চোখের কোণে তার অশ্রুর আল্পনাটি মেলায়নি। যে অশ্রু সে অনেক ফেলেছে ঘুমবার আগে, তার বিগত মায়ের শোকে, তার দুরদৃষ্টের কথা ভেবে, তার প্রদীপদার নির্মমতায় অথবা তারই নিরুদৃষ্টতায়। আর জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই উমাশংকর বললেন, নে মা, তৈরী হয়ে নে, এখনি বেরুতে হবে—

—কোথায় বাবা? গৌরী যেন আকাশ থেকে পড়লো।

—যেতে হবে কাশীপুর। তোর মামার বাড়ি। জানিস না —যে মামা তোর কলে কাজ করে? তারই বাড়ি যাই—চল। ভোরের ট্রেনটাই ধরতে হবে। আর দেরি করিস নে মা!

গৌরীর চোখের সামনে তখনো রাত্রির ঘোর কাটেনি। গৌরী বললে, আর এত বাসন, বিছানা? এই ঘরদোর? তোমার পূজো পাঠ? মায়ের শ্রাদ্ধ?

—হায়রে! উমাশংকর কেঁদে ফেললেন, সে সব কী আর আমার আছে? সে-সব ঘুচিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর। যাঁর কাজ তিনিই করবেন। আমরা কে মা ছুনিয়ায়? আমাদের কতোটুকু অধিকার আছে সব বোঝবার, সব জানবার? আর কথা বাড়াসনি—ওঠ।

ভোরেব কাক-কোকিল তখনো জাগলো না। আকাশেব তারা তখনো ডুবলো না। ছ'টি প্রাণী—বাপ আর মেয়ে এগিয়ে চললো অমেয় অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে স্টেশনের দিকে!

স্টেশন কিন্তু উদয়াচল কী? উদয়াচলের দূরত্ব কতোখানি—কতোদূরে, কে বলতে পারে? বাল্যের লীলাভূমি এই গ্রাম—কতো স্মৃতিতে সমৃদ্ধ, কতো সৌহার্দে সম্বুদ্ধ, কতো অন্তরের অন্তরতম—সেও একবার ডাকলো না। বললে না, ফিরে চল, ওরে অবুঝ, ফিরে চল!

যিনি বাঁচবার, যিনি এখানে থাকবার তিনিই শুধু থেকে গেলেন—শাখা, সিঁছুর আর লালপাড় শাড়ী পরে! শ্মশানের চিতা জ্বলে উঠেছে, কাঠ পুড়ে পুড়ে ধূম্রজালের বিছানা বিছাচ্ছে, হাওয়া এসে চঞ্চল, উন্মনা করে দিয়েছে মন, মানুষের মাথার চুল।...তবু আর তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাখা গেল না। পুড়ে পুড়ে নিঃশেষে তিনি ছাই হয়ে গেলেন! পড়ে রইলো কতকগুলো শুধু ফুল। আগুনের ফুলকি!

উমাশংকর চললেন, গৌরীও চললো। কিন্তু যিনি থাকবার —তিনিই শুধু রয়ে গেলেন স্মৃতিরূপা লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মতো!

উমাশংকর সেই অজেয়-অন্ধকারেই সকাতরে প্রার্থনা জানালেন, তুমি সতী, তুমি লক্ষ্মী, তাই তুমি চলে যেতে পারলে, কিন্তু যে রইলো, যারা রইলো তাদের যেন মঙ্গল কোরো, তাদের যেন ক্ষমা কোরো!

সতেরো

খট্ খট্ খট্…

কে যেন চলে বেড়াচ্ছে। কে যেন খুঁজছে কাকে।

এটাও অন্ধকার পক্ষ। শুক্লপক্ষ শুকিয়ে গেছে অন্ধকারে। সমস্ত গ্রাম, গ্রামের সমস্ত পথ, সমস্ত মাঠ, অচ্ছোদ নদ-নদী, আম আর তেঁতুল গাছ, বেত আর বাঁশবন—অন্ধকারে বিলীন হয়েছে। উধাও হয়েছে। অন্ধকারের প্রাণবন্যার আর শেষ নেই। আর এই অন্ধকারের জোয়ারেই কে যেন প্রেতের মতো কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কাকে কামনা করছে, কাকে নিশির মতো ডাকছে—নিস্তব্ধতার হাতছানি দিয়ে!

খট্ খট্ খট্।

ঠিক এই শব্দই সে শুনেছিল এক মাস আগে!

সমস্ত রাত্রি দুর্গা ঘুমুতে পারে না। আসলে ঘুম তার নেই, ঘুম তার আসে না।

এক মাসই হবে বোধ হয়। দুর্গা শুনেছিল এই শব্দ গৌরীদের বাড়ি।

গৌরী নেই, উমাশংকর নেই কিন্তু ভাঙা বাড়িখানি আছে। ভাঙা বাড়ি আর তার সঙ্গে অনেক স্মৃতি। বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের আলোকেও তার কবোষ্ণ উদ্দীপ্তি!

ভাঙাবাড়ি—ভাঙা বলেই বোধ হয় আছে কিন্তু জিনিসপত্র?

জিনিসপত্র নেই। জিনিসপত্র—দস্যুর মতো, অত্যাচারীর মতো অপহরণ করেছেন শ্যামাশংকর। উকিল শ্যামাশংকর, তার বাবা শ্যামাশংকর। বড়লোক সমাজপতি শ্যামাশংকর।

খট্‌…খট্‌…খট্‌…

প্রথমবার দুর্গা ভেবেছিল এ নিশ্চয় কোনো গরু এসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে যায়। চারিধার ফাঁকা, চারিধার শূন্য। কেউ কোথাও নেই। না প্রাণী, না গরু। ভয়ে তার বুকটা ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপে…

কিন্তু আজ—এতদিন পরে দুর্গা আর দমলো না। জীবনে যার আকণ্ঠ হতাশা, অনন্ত ব্যর্থতা তার আর ভয় কী? আত্মহত্যা করতেই যে সাগরে নেমেছে, অশনি-শিখায় ভয় পেলে তার চলবে কেন? থাকুক সমাজ, থাকুক স্বামী তবু সে আজ মরিয়া।

লজ্জাকে তুচ্ছ করে, শঙ্কাতে অসস্পৃক্ত হয়েই দুর্গা নেমে এল তার ঘর থেকে। ঘর পড়ে রইলো খোলা। দুটো ছেলে মেয়ে বিছানায় ঘুমুচ্ছে। ছেলে মেয়েকে সে পেটে ধরেছে ঠিক কিন্তু ছেলেমেয়ে তো তার একার আবিষ্কার নয়। বাপ যদি ভালো হয়, ছেলেমেয়ের তবেই ভাবনা ঘোচে। ছেলেমেয়ে তবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। আর যাদের বাপের চরিত্রে গলদ, ছেলেমেয়েদের সেখানে গর্ব কৈ? শিশু বলেই তারা ঘুমুতে পারে। শিশু বলেই তারা বাপকে ক্ষমা করতে পারে কিন্তু বড় হলেও কী তারা তাই করবে?

বিনিদ্র রজনীকে দুর্গা অভিসম্পাত দিল না। আশীর্বাদ করলো। মেনে নিল তার ঐশ্বর্য, মেনে নিল তার ঐতিহ্য।

আর অদ্ভুত গতিতেই চলে গেল, এগিয়ে গেল দুর্গা গৌরীদের পরিত্যক্ত বাড়িতে।

এখন কেউ জেগে নেই। জেগে নেই তার মা, তার বাবা, তার ভাইরা। আর সেই অন্ধকারেই দুর্গা যাকে দেখলো, যাকে অনুভব করলো তাকে কল্পনায়ও আনতে পারেনি এতক্ষণ! এতদিন!

—একী! প্রদীপদা! তুমি এখানে?

রাত্রির পর রাত্রি জেগে নন্দিতা আইস্‌ব্যাগ দিয়ে চলেছে প্রদীপের মাথায়। একশো চার জ্বর। জ্বর একশোর নিচে আর নামে না। যাকে বলে রীতিমতো টাইফয়েড্।

নবেন্দু রাত্রি এগারটা পর্যন্ত জাগে। তারপর তার বোনকে বলে, তোর ঘুম পেলে বলবি, আমি উঠবো, আমি উঠে দেখবো।

নন্দিতা বলে, তোমার তো ঘুম! একবার চোখ বুজলে কারো বাবার সাধ্যি নেই তোমাকে জাগায়। বাপ রে বাপ। ঘুম তো নয়, যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। আর কী বিশ্রী নাক ডাকার শব্দ।

—হ্যাঁ, বিশ্রী বৈকি। তুই শুনতে গেছিস।

—না, আমি শুনতে যাবো কেন? তুমি ঘুমিয়ে শোন। আর সেই শুনে শুনে মোহিত হয়ে ঘুমোও।

—চুপ কর, চুপ কর। বাজে কথা বলিসনি।

—হ্যাঁ, বাজে কথা বৈকি।

নবেন্দু আর নরম হয়ে থাকতে পারলো না। তড়াক করে উঠেই হাত পাখাখানা কেড়ে নিল তার বোনের হাত থেকে। আর বললে, যা, তুই ঘুমুগে যা। আমি আজ সমস্ত রাত্রি জাগবো আর শুনবো—

—কী শুনবে?

—তোর নাক ডাকা।

—মেয়েরা অমন অসভ্যের মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় না, বুঝলে? যাও, আর বীরত্বে দরকার নেই, আমি যেমন জাগি, তেমনি ঠিক জাগতে পারবো।

—বাঁচালি বাবা! নরেন্দু মোটা বপুটি নিয়ে ঘরেরই এক কোণে একটি ইজিচেয়ারে গা মেলে দিল।

আর নন্দিতা আইসব্যাগ দিয়ে চললো।

এমনি রাতের পর রাত। পক্ষের পর পক্ষ······

প্রদীপ এদের কে? কেউ নয়।

গৌরীর ওখান থেকে সেই যে সেদিন সে চলে আসে, তারপর রাত্রে দেশের বাড়িতেই ছিল। কিন্তু ভোরের দিকে সহসা তার কি খেয়াল হল, সে চলে এল কলকাতায়। আর কলকাতায় চলে এল কাউকে কিছু না বলেই। বলার একটা

বিশেষ অর্থ আছে। না বলে আসার ইঙ্গিত অনেক। তখনি শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল! ঠিক সেই ইঙ্গিতই সফল হোক—এই ছিল তার একান্ত বাসনা। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করে এক—হয় অন্যরূপ। তাই কলকাতায় আসার পরই দেখা হল বিকালে তার প্রিয়-বন্ধু নবেন্দুর সঙ্গে। নবেন্দুর সঙ্গে দেখা হল কলেজস্ট্রীটের এক রেস্তোঁরায়। দু'জনে চা খেয়ে যখন বেরুচ্ছে, সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। প্রদীপ সহসা বললে, নবেন্দু, আমার শরীরটা ভারী খারাপ লাগছে, কী করি বল দেখি?

বলতে বলতেই প্রদীপ ধরে ফেললো একটা গ্যাসপোস্ট। যেন গ্যাসপোস্টটাকে ধরাতেই মনে হল—সে আসন্ন পতন থেকে আত্মরক্ষা করলো।

নবেন্দু তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলো—জ্বর। অনুভব করলো, তার দেহ পুড়ে যাচ্ছে। আর তখনি একটা ট্যাক্সি করে সে নিয়ে এল প্রদীপকে তার নিজের বাড়িতে।

নবেন্দুর বাবা একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। মাও আছেন। ওরা ছিল বরাবর রেঙ্গুনে। সম্প্রতি কলকাতায় এসে বাসা নিয়েছে। ভাই বোন—দু'জনে দু'কলেজে পড়ে। নবেন্দুর সঙ্গে প্রদীপের কলেজের সূত্রেই আলাপ।

প্রদীপ এসে ওখানেই শয্যা নিল। নবেন্দুর বাপমার সঙ্গে তার দেখা হল না। বড়লোকের ব্যাপার বড় রকমের। বাপ গেছেন হরিদ্বারে, মা গেছেন হাজারিবাগ।

আর এদিকে দেখতে দেখতে বেড়ে চললো প্রদীপের দেহের উত্তাপ, প্রদীপের অসুখ।

ডাক্তার এসে জানালেন—টাইফয়েড্। তবে ভয়ের কিছু নেই। লক্ষণ ভালো।

আর সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য, অস্বাভাবিক—তাই দেখালো.. দেখালো নয়—প্রমাণ করলো নন্দিতা তার এই আঠারো বছরের জীবনে! সেবা সে কখনো করেনি। সেবা সে বরং নিয়েছে। কিন্তু আজ প্রাণ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, পড়া নষ্ট করে সেই-ই দেখালো কাকে সেবা বলে! কোনো অভিযোগ নয়, কোনো আপত্তি নয় তবু সে সেবা করে গেল প্রদীপের।

জ্বর যখন ছেড়ে যায়, প্রদীপ বলে, আপনার ঋণ জীবনে শুধতে পারবো না। আপনাকে দেখলেই আমার মার কথা মনে আসে!

কোথায় নন্দিতা আর কোথায় তার মা! কোথায় মল্লিকা আর কোথায় মেঘমল্লার!

নন্দিতা বলে, আপনি মাকে খুব ভালবাসেন, না?

—হ্যাঁ, মাকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু এমনিই আঘাত দিয়ে, তাঁকে ছেড়ে এসেছি যে জ্ঞান হলে আর সুখ পাই না! তার চেয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকতেই আমার ভালো লাগে!

চোখের কোণ বেয়ে প্রদীপের জল গড়িয়ে আসে!

নন্দিতা আঁচল দিয়ে সে জল মুছিয়ে দেয়। মুখের কাছে এগিয়ে আনে নিজের সুন্দর পদ্মের মতো মুখ। বলে, আপনি

মাকে যখন এতই ভালোবাসেন, আঘাত তখন তাঁকে দিলেন কেন ?

—আমি দিতে চাইনি, অবস্থা দিয়েছে। আর তার প্রতিফল আজ ভালো করেই ভোগ করছি !

—শুধু কী আপনি একাই ভোগ করছেন ?

কথাটা বলতে গিয়েও সামলে নেয় নন্দিতা। তারপর ফের সুরু করে : আচ্ছা আপনার মায়ের ঠিকানাটা বলবেন ? ঠিকানাটা জানতে পারলে তাঁকে খবর দিতে পারি।

আর এই কথাতেই রাগ আসে প্রদীপের।

—তাঁর ঠিকানাটা না নিয়ে, আপনারা কী দয়া করে আর-এক কাজ করতে পারেন না ?

—কী ? নন্দিতা উৎসুক হয় শোনবার জন্য।

—আমি বলছিলাম কি, কষ্ট আমার চেয়ে আপনাদেরই বেশী হচ্ছে। আমি তা বুঝতে পারছি। তাই বলছিলাম—যদি অনুগ্রহ করে একটা হাসপাতালে আমাকে ভর্তি করে দেন বড় ভালো হয়।

—হাসপাতালে গেলে কী এখানের চেয়ে আপনি বেশী আরামে থাকতে পারবেন মনে করেন ? আর, তারা আপনার ঠিকানা চাইবে না ?

এবার ভিতর ভিতর উষ্ণ হয়ে ওঠে নন্দিতা।

—আরামের কথা হচ্ছে না। প্রদীপ বলে, আপনাদের অসুবিধের কথাই ভাবছি।

—আমাদের অসুবিধের কথা আপনাকে আর ভাবতে হবে না, লক্ষীটি আপনি স্থির হয়ে ঘুমুন।

বেলা যতো বাড়ে জ্বরটা আরও ঠেলে ওঠে।

থার্মোমিটারের পারদ যন্ত্র বিকল হয়ে গেল নাকি ? ক্রমাগত পাখাটানা, ক্রমাগত আইসব্যাগ ! এ যেন শাস্তি। আর এমন বিশ্রী অসুখ নন্দিতা কখনো দেখেনি।

কিন্তু সেজন্যও সে কাতর ছিল না। কাতর যাতে হল, সে হচ্ছে—জ্বরের ঘোরে প্রদীপের চীৎকার। এ-চীৎকারের যোগসূত্র কোথায় তাই সে ভেবে ভেবে দিশেহারা হল।

প্রদীপ আপন মনেই ডাকে—গৌরী…গৌরী!

তারপর খানিকটা চুপ-চাপ। ফের সুরু করে প্রদীপ জ্বরের ঘোরে ঃ গৌরী, না, না, বাবা না বলুক, তোমাকে বিয়ে আমি করবো। গৌরী…গৌরী…

যেন দুঃস্বপ্নের দ্বীপ থেকে কেউ কাঁদছে! কেউ কাতরাচ্ছে! কেউ চেন-বাঁধা অবস্থায় চেন ছিঁড়তে চাইছে। আর যা প্রদীপের দুঃস্বপ্ন, নন্দিতার পক্ষে তাই দুরন্ত ট্রেন-দুর্ঘটনা।

কিন্তু নন্দিতা কিছুই বললে না। কিছুই চাইলো না জানতে, জানাতে।…

খোলাছাড়ানো কমলা লেবুর উপর উড়ন্ত পোকার লুব্ধ আনন্দ নিবে গেল। ডাবের জলের অপলক অপচয় শেষ হল। ওষুধের পঞ্চাশ রকমের শিশি একদিন সরে গেল।—সরে গেল কক্ষান্তরে।

আর প্রদীপ নীরোগ হয়ে উঠলো অপরূপ রূপে। অপরূপ ব্যঞ্জনায়। পেল পথ্য আর ঠিক কদিন পরেই নন্দিতা ভাবলো, এইবার সময় হয়েছে, সময় হয়েছে জিজ্ঞেস করবার—গৌরী কে? গৌরী কোথায় থাকে? গৌরী কী নন্দিতার চেয়েও সুন্দরী?

আঠারো

হাওড়া স্টেশনে—ট্রেন থেকে নেমে উমাশংকর কিন্তু হকচকিয়ে গেলেন। এ তিনি কোথায় এলেন? এ যে কলকাতা! কলকাতায় এর আগেও এসেছেন কিন্তু বেশী নয়। জীবনে ছু'বার! এক শিষ্য থাকতো তাঁর। সে-ই এনেছিল। সে শিষ্য তাঁর বর্তমানে বিগত। আর তখনকার দিনের সঙ্গে আজকের দিনের কতো তফাৎ। তখন কলকাতায় এসেছিলেন এই আনন্দ নিয়ে যে তিনি আবার ফিরে যাবেন তাঁর গৃহ-সংসারে, তাঁর ত্রিলোচনার কাছে। হাতে নিয়ে ইলিস মাছ, একটা বোঁচকা আরো কতো কি!

আজ আর সে আনন্দ নেই। একটা ভিক্ষুকের জীবনেও আশা আছে, অবলম্বন আছে কিন্তু তিনি আজ বিশ্বসংসারে একক। ভিক্ষুকেরও অধম। তিনি আজ সর্বহারা! আর তাঁর অসহায় একাকীত্বের উপর চরম বোঝা হয়েছেন তিনি নন, তাঁর কন্যা—গৌরী! গৌরী যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হত! কিন্তু ছেলে হলে আর আসবার তাঁর প্রয়োজন কী ছিল! নারায়ণ, উপায় দাও। শক্তি দাও।

উমাশংকর গৌরীকে নিয়ে নামলেন ট্রেন থেকে। মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করলেন। এখন যে কী হবে তা তিনি জানেন না। কাশীপুরই বা কোথায়—তাও তাঁর অজানা।

অথচ তিনি এসেছেন কাশীপুরকে উপলক্ষ্য করে। গৌরীর মামাকে বার করবেন খুঁজে, এই বিপুল জনারণ্যের ভিতর থেকে! বিরাট জঙ্গল থেকে একটি বিষহর বনৌষধি। বুদ্ধিভ্রষ্ট আর কাকে বলে!

বুদ্ধিভ্রষ্ট বলতে হয়, বলো। উমাশংকর তা স্বীকার করবেন না। তিনি বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেন নি, দিয়েছেন বুদ্ধিমত্তার। তিনি গলায় ফাঁস পরেননি। পেরেছেন ফাঁস কেটে পালিয়ে আসতে। সাফল্যের সঙ্গে তাঁর এই পশ্চাদপসরণ—সমাজকে স্বীকার করা নয়। সমাজের অশিষ্ট আচরণকে এড়ানো। সমাজকে সন্তুষ্ট করা নয়, সমাজকে শাসন করা। সমাজকে শুশ্রূষা করা নয়—সমাজকে সতর্ক করা।

তাই তিনি সাহসে বুক বেঁধে নারায়ণের নাম নিয়েই এগুতে লাগলেন। আর, কী ভাগ্য, তাঁর পায়ের ধূলো নিতে কে যেন হেঁট হয়ে পড়লো।

—একি, তুমি?···রণজিৎ?

রণজিৎ সোজা উঠে দাঁড়ালো। হাসলো।—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি রণজিৎ।

—তা, তুমি বাবা এখানে কেন? উমাশংকর বিহ্বলের মতো জিজ্ঞেস না করে পারলেন না।

উত্তর দিল রণজিৎ: এসেছি আপনাদের নিয়ে যেতে।

যেন ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ছুটে এল গৌরী।

—এত বড় সর্বনাশের পর এখনো আপনার লজ্জা নেই,

ফের এসেছেন নিয়ে যেতে ? বাবা, যেতে হয় তুমি যাও, আমি যাবো না, আমি যাবো না ওর বাড়িতে।

উমাশংকর কিছুই বুঝতে পারলেন না। হাঁ করে তাঁর মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

গৌরী বলতে লাগলো, বাবা, এর জন্যেই আজ আমাদের এই অবস্থা। তুমি জানো না, কী সাংঘাতিক লোক এ। তোমাকে ভিটেছাড়া করেও এ নিশ্চিন্ত হয়নি, ফের এসেছে—পথে নামিয়ে আমাদের সর্বনাশ করতে !

সেদিনের রাত্রের ব্যাপারটা নিয়ে এখনো কোনো জিজ্ঞাসা-পড়া করেননি উমাশংকর মেয়েকে। মোট কথা, তিনি বিশ্বাসই করেননি—এরকম কোনো ব্যাপার ঘটতে পারে। তবু যে ঘটেছে, এ শুধু সমাজের চক্রান্ত আর বীরেন্দ্র কিশোরেরই বুদ্ধিজাত ব্যাপার বলেই তিনি একান্ত করে জেনেছিলেন। কিন্তু এ-আবার কী শুনছেন ?

—হ্যাঁ রণজিৎ ? গৌরী এ-সব কী বলে ?

উমাশংকর রণজিতের মুখের দিকে তাকালেন।

উড়িয়ে দিল রণজিৎ হাসির উল্লোলে সমস্ত অভিযোগ। —যা বলছে, ওকে বলতে দিন। মনে রাখবেন, আমি আপনার পর নই। গৌরী আর আপনি—পথে ভাসবেন, এ, আর যার কাম্য হয় হোক—আমার নয়। চলে আসুন দেখি······

এক ঘণ্টা আগেও উমাশংকরও জানতেন না, কোথায় তিনি

যাবেন, কোথায় গিয়ে উঠবেন। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে সত্যই তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হল কী—গৌরীও? কে জানে!

রণজিতের আর কেউ নেই। শুধু আছেন একটি বিধবা দিদি। বিধবা দিদি বেশী কথা বললেন না কিন্তু যত্ন করে গেলেন মুখ বুজে।

বাসাবাড়ি। তিনখানি ঘর। একটি ঘরে রইলেন উমাশংকর। দুপুরে সেখানেই তিনি ঘুমুলেন অকাতরে। পাশের ঘরে রইলো গৌরী। আর তার পাশের ঘরে রণজিতের দিদি।

সমস্ত দিন রণজিৎ কোথায় ছিল, কে জানে। সন্ধ্যায় ফিরে এল। আর ফিরে এসে দেখলো, উমাশংকর তখনো শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরটা নাকি ভালো নেই, চাপা সর্দি হয়েছে!

রণজিৎ যেন অন্য মানুষ! সহসা বদলে গেছে।...শ্বশুর বাড়ি গেলে সে ভুলেও উমাশংকরের খোঁজ করতো না। করতো না সে নিজে থেকে, কি তার শ্বশুর শাশুড়ী তা পছন্দ করতেন না, সেই জানে। কিন্তু আজ উমাশংকর আর গৌরীকে পেয়ে সে জানতে দিল না, তারা পর—তারা অন্য কেউ।

রণজিৎ উমাশংকরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললে। নানা রকমের কথা। গৌরীকে বললে, তুমি বরং একটু তেল গরম করে বাবার বুকে মালিস করো। দেখো, উনি যেন অসুস্থ হয়ে না পড়েন—এই গরিবের বাড়িতে। তাহলে একা উনিই কষ্ট পাবেন না, সকলের সঙ্গে—তোমাকেও পেতে হবে।

দু'তিন দিনেই উমাশংকর সুস্থ হয়ে উঠলেন।

রণজিৎ বললে, এক কাজ করুন না। কাছেই সিনেমা আছে। আজ বিকালে গিয়ে ছবি দেখে আসুন।

পকেট থেকে একটা টাকা বার করে রণজিৎ উমাশংকরের হাতে দিল।

উমাশংকর লজ্জিত, বিব্রত বোধ করলেন।

—একে তোমার আমরা গলগ্রহ হয়ে আছি, কিছু দিতে পারছি না, তার ওপর তুমি এরকম করলে বাবা বড়ই কষ্ট হয়। না, না, সিনেমা আমি দেখবো না।

উমাশংকর টাকাটি ফিরিয়ে দিতে গেলেন।

চেপে ধরলো তাঁর হাত—রণজিৎ।—দুনিয়ায় কে কার গলগ্রহ, বলতে পারেন? তা ছাড়া, দিতেই যে শুধু হয়, আর নিতে নেই, এমন কোনো কথা আছে কী? দেখুন, আমার বাবা নেই, আমার বাবা থাকলে তিনি হয়তো আপনারই মতো থাকতেন আমার ওপর নির্ভর করে। তখন আমি কিছু দিলে তিনি ফিরিয়ে দিতে পারতেন কী? আমাকে আপনার ছেলে বলে ভাবা সম্ভব হতে পারে না?

টাকাটি গ্রহণ করলেন বটে উমাশংকর কিন্তু চোখ তাঁর অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

—কেন হবে না বাবা? উমাশংকর ধরা গলায় বললেন, এই বিপদের দিনে তুমি যে ভেসে যেতে দিলে না, এও কী পুত্রের-ই কাজ নয়? সে-কথা কী সহজেই ভুলে যাবো?

রণজিৎ কথাটা শুনলো বলে মনেই হল না। কিন্তু সে নিজের কথাটা বলবার সুযোগ পেল সুশৃঙ্খলে।

—জানেন আমার অবস্থা? আপনারা আসবার ছু'দিন আগেও আমার চাকরি ছিল না। আত্মহত্যা করবার কথাটাই মনে আসছিল বার বার। বড় অফিসে চাকরী করতাম। ছাঁটাই সুরু হল। সর্বপ্রথম শিকার হলাম আমিই। গেলাম শ্বশুর বাড়িতে কিন্তু আপনার ভাইঝি এমন বিশ্রী স্বভাবের মেয়ে-মানুষ যে তাড়িয়ে দিতে এতটুকু সবুর করলো না। আপনারা এলেন আমার বাড়িতে। আর আপনার পুণ্যের এত জোর, ডেকে আজ এক অফিস আমাকে চাকরি দিল, হাতে কিছু নগদ দিয়ে। আপনার সেবা করতে পারাটাও ভাগ্যের কথা।

ভাগ্যের কথা কিনা ভগবান জানেন কিন্তু তার কোনো কথাই গৌরী মেনে নিতে পারলো না মনে মনে। পুরুষদের চিনতে—মেয়েরা যতো সহজে পারে, পুরুষ পারে না। পুরুষ পৌরোহিত্য করতে পারে কিন্তু পরিণাম বোঝে পতিব্রতারাই!

আর ঠিক তার কয়েকদিন পরেই :

দিদি গেছেন সন্ধ্যায় মদনমোহনের আরতি দেখতে। উমাশংকর গেছেন পার্কে বেড়াতে। গৌরী একটা ঘরে কী কাজ করছিল একা একা। আর রণজিৎ এসে ঠিক এমনি সময় দরজায় খিল এঁটে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো নয়—হাসলো। হাসলো খিল খিল করে।

—কেমন? এবার? এবার কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে?

ঠিক এই অবস্থার জন্যই যে গৌরী প্রস্তুত ছিল, বলা কঠিন। শুধু ভয় পেল নয়, ভয় পেয়েই যেন সে কাঁপতে লাগলো কাটা ছাগলের মতো। চীৎকার করে উঠবে কিনা, তাও ভাবতে লাগলো।

আর, আরো জোরে, আরো আনন্দে হেসে উঠলো রণজিৎ মহাকাল মহোরগের মতো।

সুরু করলো: উঃ, যা হোক তেজ বটে! স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কী গর্জন! এত বড় সর্বনাশের পর এখনো আপনার লজ্জা নেই, ফের এসেছেন নিয়ে যেতে? বাবা, যেতে হয় তুমি যাও, আমি যাবো না, আমি যাবো না ওর বাড়িতে। যাবে না তো কোথায় যেতে শুনি?

রণজিতের কুক দিয়ে হাসির সে কী উপঢৌকন। হাসির সে কী উপহার! যেন "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ!"

গৌরী শুধু কাঁপতে লাগলো। কথা বললে না।

রণজিৎও ছাড়বে না।—কথা বলো ··

—কী কথা বলবো, একটা ভণ্ডর সঙ্গে? এতক্ষণে যেন মুখ খুলে গেল গৌরীর।—কেন, গঙ্গার জল কী শুকিয়ে গেছে, যে যেতে মানা আছে?

—গঙ্গার জল পবিত্র মানি কিন্তু মা গঙ্গাও উদ্ধারের উপায় দেখান না, যদি তার কোলে আত্মহত্যা করা হয়। এটা বোঝো তো?

—আত্মহত্যা যে করবে, সে উদ্ধারের উপায়ের কথা ভাবে না। আত্মহত্যাটাই তার কাছে বড় কথা। বুঝলেন? নিজের বাড়িতে পেয়ে এবার যে বেইজ্জৎ করবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন সে আমি আগেই টের পেয়েছি।

—টের পেয়ে কী করেছ সেইটে শোনবার জন্যেই তো দরজায় খিল দিলাম। আর লজ্জায় দরকার কি? এগিয়ে এসো।

দু আঙুল এগুলো রণজিৎ। আর শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো গৌরী।

—তা হলে বেইজ্জৎই হতে চাও দেখছি ভালোভাবে!

রণজিতের মুখে আবার এক প্রকারের হাসি।

রণজিৎ বলে যেতে লাগলো: আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন সুন্দর, ভাবো দেখি। পুরুষ হাজার পাপ করুক, পুরুষ হাজার দোষ করুক, বিয়ে করুক, ব্যাভিচার করুক কিচ্ছু তাতে যায় আসে না। কিন্তু পরমা সুন্দরী কুমারীর বেলায়? কেউ ক্ষমা করবে না, কেউ তাকিয়ে দেখবে না সে সত্যই দোষী, কী নির্দোষ। সে সত্যই অন্যায়কারী, কী অন্যায়ের বলি। সে কী হারালো, কী পেল। মাত্র পাঁচ মিনিটের পালা। পাঁচ মিনিটের ঘটনা। মানুষের জীবনের আয়ুর কাছে কিছুই নয়। চলে এলাম পরাজিত সৈন্যের মতো। আর চারিধারে পড়ে গেল হৈ চৈ। সমাজের রাগ—ও কেন একা ভোগ করতে গেছলো? কেন ভাগ দিল না? কেন শকুনীর মতো ডাকলো না, ভাগাড়ের এই ভৈরব-উৎসবে? ভাগাড়ের এই সূত্রযজ্ঞে? সে সব

কথা কী আমি শুনিনি ভাবছো? ভাবছো, এমনি আমি হৃদয়হীন?

এবার যেন অনেক সাহস পেল গৌরী। কুটিল কুয়াসা থেকে খানিকটা কমনীয় সূর্যরশ্মি।

আর এগিয়ে এল গৌরী। গৌরী বললে.—যদি হৃদয়ই আপনার থাকবে, এমন কাজ করতে গেলেন কেন শুনি? আপনার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে অন্ততঃ তাদের মঙ্গল তো আপনার দেখা উচিত ছিল।

—তাদের অমঙ্গল তো কোথাও হয়নি। সমাজের চোখে তোমরা একঘরে হয়েছ কিন্তু আমার শ্বশুর কী হয়েছেন? তিনি তো পার্টিসন তুলেই ওপথ আগে থাকতে মেরে রেখেছেন। তা ছাড়া তিনি তো বড়লোক, তাঁকে ছোঁবে কে? আর আমি যে এ কাজ করেছি, দুর্গা ছাড়া কেউ জানত না, কেউ বিশ্বাসও করবে না।

—কিন্তু এমন শত্রুতা আপনি কেন আমাদের সঙ্গে করতে গেলেন? আমি আপনার কী করেছি?

—তুমি কারোরই কিছু করোনি। কিন্তু এ শত্রুতা আমি না করলেও আর একজন করতো। আর, সে যা করতো তার তুলনা হয় না! আমার এটাকে শত্রুতা বোলো না, বলো মিত্রতা!

—তাই রুদ্ধ ঘরে আপনি এসেছেন ভয় দেখাতে?

—ভয় তোমায় দেখাবো না, ভয় তোমার ভাঙাবো। তুমি বোসো ওই চেয়ারটায়।

রণজিৎ চটপট দরজাটা অর্গলমুক্ত করলো। খুলে দিল—যতদূর খোলা যায়।

—সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গেছলে, না? রণজিৎ ফিরে এসে নিজেও একটা চেয়ারে বসলো।

—ভয় হয়, রণজিৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, তোমার অপরাধ নয়, অপরাধ আমার ভালোবাসার। অপরাধ আমার অতৃপ্ত যৌবনের। তুমি ভয় করে কী করবে? আমি আমার নিজেরই প্রবৃত্তি থেকে এখনো মুক্ত হতে পারছি না। ভয় আমি নিজেকেই করি। বিয়ের বাসরে যেদিন তোমায় প্রথম দেখলাম, সেদিনই মনে হল, কেন আমি তোমার মতো একটি বৌ পেলাম না? কেন পেলাম দুর্গার মতো কালো, কুৎসিত একটা ঝগড়াটে মেয়ে? তারপর এই ক'বছরে ছেলে হয়েছে—মেয়ে হয়েছে কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমি কী সুখী হয়েছি? রূপের পিপাসা কী মরে গেলেও মেটে? তবুও আমরা মানুষ। ভগবান আমাদের বিবেক দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার শক্তি দিয়েছেন। তাই নিয়েই আজ যুঝতে হবে। সেই অবলম্বন নিয়েই আজ দিনানুদৈনিক জীবনের পথে পথে পলাতক হতে হবে। তাই, তোমার কাছে ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাই, আমার দুর্বল মুহূর্তের দুঃসাহসিক অপরাধের। শাস্তি চাই আমার সশস্ত্র শক্তির অক্ষম অপব্যয়ের।

রণজিৎ থামলো। ফের যোগ করে দিল একটা কথা।

—তোমাকে বান্ধবীরূপে আর পেতে চাই না। তুমি হলে আজ থেকে আমার বোন।

গৌরী আর পারলো না। এগিয়েই গেল। আর এগিয়ে গিয়ে পদধূলি নিল রণজিতের।

এক ফোঁটা জল—হয়তো আনন্দাশ্রুই হবে—রণজিতের পায়ের উপর ঝরে পড়লো।

রণজিৎ আশীর্বাদ করলো। আর আশীর্বাদ করেই সে গৌরীকে ঠিক যখন ওঠাতে যাচ্ছে, ঘরে ঢুকতে ইতঃস্তত করলো খানিকটা কেসে নকড়ি।

নকড়ি দুর্গার মেজ ভাই। আইনে সে সাবালক। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথায় ছোট একটু টিকি। কালো কপালের একপাশে একটু জড়ুল। সামনের দাঁত একটু নয়—বেশ খানিকটা উঁচু। আর তার হাতে বিরাট একটা পুঁটলী। পুঁটলীর মধ্যে গোটাতিনেক নারকেল, বড় বড় দুটো ওল, এক কৌটো বড়ি, বড় একটা লাউ আর লাউশাক, পুঁইশাক মানে যেখানে যতো শাক আছে তার গন্ধমাদন!

নকড়ি শুধু চেয়ে চেয়ে ব্যাপারটা দেখলো। আর দেখলো নয়, বিস্ময়ে বাকশক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আর দাঁড়ালো না, ছবি তুলে নিল জামাইবাবুর আর গৌরীর এই অবস্থার, এই পারিপার্শ্বিকতার—তার মনের ক্যামেরায়। কী আশ্চর্য, গৌরী কিনা এখানে এসে জুটেছে। আর দিদি তাকে পাঠিয়েছে জামাইবাবুর খোঁজ নিতে—এত জিনিসপত্র দিয়ে! জামাইবাবুর এই সংসারে!

উনিশ

গৌরী কী নন্দিতার চেয়েও সুন্দরী ?

এ-প্রশ্ন নন্দিতা না করে থাকতে পারলো না। এ-প্রশ্ন মেয়েদের চিরন্তন। তুমি একজনের সেবা নেবে অথচ স্বপ্ন দেখবে অপর একজন মেয়ের—এ মেয়ে হয়ে সহ্য করা অসম্ভব। সহ্য করার দুশ্চেষ্টা দুঃখকর। সহ্য করার দুর্মতি দুর্বিসহ। তবু নন্দিতা শুনতে চাইলো, গৌরী কে ?

—গৌরী একটি গ্রাম্য মেয়ে।

সরল ভাবে উত্তর দিল প্রদীপ। আর কিছুই সে বললে না।

—আর কিছু বলবার নেই আপনার ? নন্দিতাও ফের জিজ্ঞেস করলো।

—না, কী আর বলবো ?

নন্দিতা চলে গেল সেখান থেকে। ফিরে এল ফের হাতে নিয়ে একটা ছবির এলবাম। প্রদীপকে দেখিয়ে দেখিয়েই সে পাতাগুলো তার ওল্টাতে লাগলো আর নিজে দেখতে লাগলো ছবিগুলো।

প্রদীপের কৌতূহল হল। বললে, দেখি ছবিগুলো······

—কী আর দেখবেন ? এ ছবির বই······

—দেখতে মানা আছে নাকি ?

—আছে বৈ কি। নন্দিতা বললে, যেমন মানা আছে গৌরীর

সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার! সেও যেমন একটি গ্রাম্য মেয়ে, এও তেমন একখানি ছবির বই। এতে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না?

পরিহাসটা পরিপাক করতে বেশী সময় লাগলো না প্রদীপের।

প্রদীপ বললে, শুনলে কী আপনি সুখী হবেন?

—দুনিয়ায় সব কথা যে সুখী হবার জন্যেই শুনতে হয়, এমন কোনো কথা আছে নাকি? কিছু শুনে দুঃখিত হতেও দুঃসময়ে দারুণ আনন্দ হয় না কি?

—ভগবান করুন, দুঃসময় আপনার যেন না আসে। আপনার সেবার কথা চিরকাল—চিরদিন আমি মনে রাখবো।

—চিরকাল—চিরদিন মনে রাখবার আপনার ক্ষমতা কি? আপনি নিজেই কী চিরকালের? চিরদিনের?

—তবু যতদিন বাঁচবো।

—আমার কথা মনে রাখতে গেলে বাঁচাও আপনার হবে না বেশী দিন। নন্দিতা বললে, তার চেয়ে গৌরীর কথা মনে করুন, গৌরীর কথা বলুন।

—বেশ, গৌরীর কথাই বলছি। গৌরীর সঙ্গে ভাব আমার বাল্যবধি। আমি এখানে আসবার আগে তার মাকে খুব অসুস্থ দেখে আসি। তার মা আর আমার মা—উভয়েরই ইচ্ছে, আমাদের দু'জনের বিয়ে হয়। কিন্তু আমার বাবা বড় বিরূপ। তাঁর ইচ্ছে নয়, এই হা-ঘরের একটী মেয়েকে তিনি বৌ করেন। আসবার আগে শুনি, গৌরী আমায় বলে, কে একজন গৌরখুড়ো

নাকি তার বিয়ের সম্বন্ধ করছে পঞ্চান্ন বছরের এক বুড়োর সঙ্গে! জানি না, এতদিনে তার বিয়ে হয়ে গেছে কিনা। কিন্তু দেখুন দেখি, কী অন্যায় অবিচার।

—অবিচার কার?

—এই সমাজেরই ধরুন···

—সমাজের কী আপনি বাইরে?

—বাইরে না হলেও আমার তো কোনো হাত নেই।

—কেন, আপনি জগন্নাথ হয়ে গেছেন নাকি?

—আমি তো অসুখে পড়েছিলাম··

—অসুখে তো আর চিরকাল পড়ে ছিলেন না। তার আগে?

—বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়।

—তবে আমার যেটুকু বক্তব্য: পুকুর থাকলেই পাঁক হয়। পুকুর থাকলেই পানা আসে। সমাজ থাকলেই সংস্কার জন্মায়। তা কু-ই বলুন অথবা সু। পঙ্কোদ্ধার অথবা সমাজসংস্কারের প্রয়োজন আছে বৈ কি। তবে কে তা করবে, যদি আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন। সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই। আমি বলি কী, আপনি এবার চলে যান। এখন তো একটু সেরেছেন! আর টাকাপয়সার দরকার থাকে তো বলুন। আপনার সাফল্যের পথে একবার সহায় হয়ে দেখি—কিছু ঘটকালি পাওয়া যায় কিনা!

হাসতে গিয়েও নন্দিতার মুখ কান্নার মতো করুণ হয়ে দাঁড়ালো। আর সে মুখ ভাগ্যি দেখতে পেল না প্রদীপ। তাই অনিচ্ছার সঙ্গেই সে রাজী হল চলে যেতে।

যাবার আগে নন্দিতা বললে, গৌরীকে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়ি আসবেন। কেমন? দেখবেন; যেন ভুলবেন না!

কী মন নিয়ে প্রদীপ বেরিয়ে গেল কে জানে কিন্তু নন্দিতারও নিমেষে যেন সব কাজ শেষ হল।

খাটের উপর সাদা, পুরু বিছানাটায় গিয়ে সে লুটিয়ে পড়লো।

নন্দিতা কী কাঁদবে? কাঁদবে কী জন্য? কাঁদবে কার জন্য? আর এত সহজে এই স্বার্থপর পুরুষগুলোর জন্য কাঁদতে গেলে তো কতো জন্মই বৃথা যাবে। তার চেয়ে জোরে হাসা উচিত। জোরেই সে হাসুক!

নন্দিতা হাসতে লাগলো জোরে। আরো জোরে! আরো—আরো জোরে!

—কিরে? তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি?

ঘরে এসে ঢুকলো সুদীপ্তা! সেই সুদীপ্তা—বীরেন্দ্রকিশোরের বৌমা, সন্দীপের স্ত্রী, প্রদীপের বৌদি! রূপে আর ঔজ্জ্বল্যে যে অনবগুণ্ঠিতা, প্রেম আর পরিহাসে যে অকুণ্ঠিতা, সংঘাত আর সৌহার্দে যে স্বর্ণময়ী!

ঘরে এসে ঢুকলো সুদীপ্তা। আর বাইরে—বাড়ির গেটে তার মোটর রইলো মোতায়েন।

—একি। দিদি? এসো···এসো, এসো···এসো···

সুদীপ্তাকে কতোদিন পরে দেখে নন্দিতা যে কী করবে, কোথায় বসাবে, কী বলবে, ভেবেই আকুল!

এ যেন নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে আচম্বিত বৃষ্টিধারা!

নন্দিতা গলা জড়িয়ে ধরলো সুদীপ্তার।

—অত হাসছিলি কেন বল দেখি? সুদীপ্তাই প্রশ্ন করলো।

—একটা ভারী মজার ব্যাপার হয়েছে দিদি।

—কী ব্যাপার?

—একটা ছেলে অনেকদিন রোগ ভোগ করলো আমাদের এখানে থেকে। দিল না তার পরিচয়। রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠতো—গৌরী, না, না, বাবা না বলুক, তোমাকে বিয়ে আমি করবো, করবো। আমরা কোথায় ভাবতাম তার বাঁচবার কথা, সে ভাবতো বিয়ের কথা। তারপর একটু একটু করে সে সেরে উঠলো। আজ বলে কিনা, আমি গৌরীর কাছে যাবো। শোনো দেখি কথা! আমি যে সেবা করলাম—আমাকে তো ভালোবাসবি! বিয়ে না হয় নাই হল, কবিতা লিখতে তো কেউ মানা করেনি। আর কবিতা না লিখলো, আত্মহত্যা করে তো কবিতা করতে পারতো!

—বালাই ষাট, আত্মহত্যা করতে যাবে তোর জন্যে?

সুদীপ্তা যেন বড় বেশী আশান্বিত হয়ে উঠলো: আচ্ছা, ছেলেটির নাম কী প্রদীপ?

—হাঁ হাঁ, তুমি কী করে জানলে তাকে?

—আরে, তাকে জানবো না? আমি যে তার বৌদি। তাই তো, প্রদীপ এখানে ছিল আর এদিকে এত কাণ্ড হয়ে গেল! সুদীপ্তা বললে, তাই ঠিক যেন তাকে দেখলাম মনে হল।

—তুমি তাকে দেখলে ?

—দেখলাম বৈ কি ! মোটরটা তোদের বাড়ির সামনে যেমন এগিয়ে এল, পাশ কাটিয়ে সেও চলে গেল। আহা, তখন যদি বুদ্ধি করে একবার ডাকতাম তাকে !

—বুদ্ধি করে একবার ডেকেই দেখলে না কেন ?

—ওইটেই তো নির্বুদ্ধি !

—তুমি যেটাকে নির্বুদ্ধি বলছো আমি বলি সেইটেই সুবুদ্ধি ! বুদ্ধি করে অনেক সময় অনেককে ডেকে ঠকতে হয়। বোঝো তো ?—নন্দিতা বললে, বারে, এখনো দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো···

সামনের কোচটায় সুদীপ্তা বসলো। আর তার বসা নয়, এক হাত ডুবে যাওয়া।

সুদীপ্তাকে কেমন অস্থির, সান্ত দেখাতে লাগলো। অস্থিরই সে হল প্রদীপের খবর শুনে।

সুদীপ্তা বললে, তোদের খবর কী ? কাকা-কাকীমা কোথায় ?

—কাকা গেছেন হরিদ্বারে, কাকীমা মানে আমার মা গেছেন হাজারিবাগ।

—ভালো। আর এখানে ?

—এখানে আমি আর দাদা। দাদা করছেন পড়াশোনা আর আমি করছি হানিমুন···

—বটে ! হানিমুনটা কী রকম ?

—এই যেমন এতদিন করলাম। তোমার দেওর অসুখের যন্ত্রণায় প্রলাপ বকতে লাগলো আর রাত জেগে আমি তাই শুনতে লাগলাম।

—প্রলাপ শুধু শুনেই গেলি—প্রশ্রয় দিলি না ?

—প্রশ্রয় দিলে কী আর সে চলে যেতে পারতো ? তা হলে তো পিছু নিতো !

—তোর দেহসৌরভের পিছু না নিয়ে সে ভালোই করেছে। আমারও ইচ্ছে, তুই তাকে টানিসনি।

—পাগল ! আমি অত বে-হিসেবী ? যদি বা টানতাম আর তো কখনোই নয়। শেষে কী এক বাড়িতে পড়ে তোমার সঙ্গে লাঠালাঠি করবো ? কিন্তু তোমরা থাকতে দেওরটিকে এখানে পাঠালে কেন ?

—আমরা নেই বলেই হয়তো রুখতে পারিনি। দেওর তাই এসেছিল তোরই কাছে ভাগ্যান্বেষণে। কা, যে ভগবান তাকে সৃষ্টি করেছে, সে-ই পাঠিয়েছিল ! কে জানে তা ? কিন্তু আমি ভাবছি, কোথায় সে এখন গেল ?

—যাবার সময় আমি তো তাকে বলেছি একদিন আসবেন আমাদের বাড়ি—গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে। তা হলে তোমায় অপেক্ষা করতে হয় সেই দিনের জন্যে !

—তুই আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিসনি নন্দিতা। একটু কফির ব্যবস্থা দেখ দেখি। আমি ততক্ষণ ভেবে ঠিক করি—আমার কী কর্তব্য।

—কিন্তু এত সহজে তুমি যদি কফি পাও, কাটা ঘায়ের সৌন্দর্য কী রইলো ? আগে তোমার কথা বলো। কোথা থেকে আসছো, সব শুনি। তবে তো কফি পাবে।

নন্দিতা কালবিলম্ব না করে কেটলীটা ইলেট্রিক হিটারে চাপিয়ে এল। চাপিয়ে এসে থিতিয়ে বসলো।

সুদীপ্তা বললে, এসেছিলাম বাবার কাছে। বালিগঞ্জে। ছিলাম না, এখনো রয়েছি। ওখানেই শুনলাম, তোরা চলে এসেছিস রেঙ্গুন থেকে। তাই শুভ কাজ যতো তাড়াতাড়ি সারা যায়—সারতে এলাম। ভালো কথা, তোরা কবে যাচ্ছিস ?

—যাই তো মাঝে মাঝে। কিন্তু তোমায় ছুটি দিল কে, যে তুমি গ্রাম থেকে সহরে এলে ?

—ছুটি এবার আর কেউ দেয়নি। নিজের ইচ্ছাতেই ইস্তফা দিয়েছি।

—সে কী ? নন্দিতা রীতিমতো বিস্মিত হল : এত বড় খবর কাগজে উঠলো না ?

—এ তো আর রেপ-কেস নয়, যে রিপোর্টাররা কাগজে তুলবে। এ নিছক শ্বশুর-পুত্রবধূ পালা !

আর পালাটা কী রকম তাই মনে করতে চাইলো সুদীপ্তা।

সমাজে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় রায় দিয়ে ফিরে এলেন বীরেন্দ্রকিশোর। সামান্য মশা মারতে, এত বড় যে একটা কামান দাগার প্রয়োজন, এ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সুদীপ্তা। বীরেন্দ্র-

কিশোর ভাবলেন, তিনি বড় বিজয়ী হয়েছেন। আর সুদীপ্তা ভাবলো তিনি কতো নিচে, কতো নির্জনে নেমে গেছেন। অন্যায়কে মেনে নেওয়ার মতো মস্ত পাপ আর কিছুতে নেই। এই কথাই সুদীপ্তা ভাবলো। আর শুধু সে ভাবলো না, অপরের মনেও এ-ভাব যাতে সঞ্চারিত হয়, পল্লবিত হয় তারও চেষ্টায় সে প্রস্তুত হল।

সন্দীপকে বললে, শুনলাম সব। তোমার বাবা কী করেছেন আর উমাশংকর কী করেছেন, তাও শুনেছি। তুমি কী স্বীকার করো, এই শাস্তিই তাদের উপযুক্ত হয়েছে?

—আমার স্বীকার-অস্বীকারে কী আসে যায়? বাবা যদি ভুলই করে থাকেন—তুমি কী বলতে চাও, আমি তার বিচারক হব? আর তা ছাড়া, বাবা এখানে একা কিছু করেননি। করেছেন সমাজ, করেছেন সমাজপতিরা। বাবা সেই সমষ্টির মধ্যে একজন সমাহারমাত্র! ব্যষ্টির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে টানাটানি করা আক্রোশেরই নামান্তর।

—এত বড় কথা তুমি আমাকে বললে?

সুদীপ্তা যেন অশ্রান্ত অগ্নি হয়ে উঠলো। অগ্নির মতোই সুতনু। অগ্নির মতোই আগ্নেয়ী!

স্বামী-স্ত্রীর বচসা চলছিল তো চলছিল! সে জায়গায় বীরেন্দ্রকিশোরের মাথা গলানোটা কী উচিত ছিল? উচিত অনুচিতের প্রশ্ন আর উঠলো না। বীরেন্দ্রকিশোর সন্দীপকে ডেকে বললেন, কী হয়েছে?

সন্দীপ পরিষ্কার বললে, আপনার এ কাজটা করা উচিত হয়নি। আপনার বৌমা তাই বলছেন।

—কে বলছে ? বৌমা ? বটে ! বৌমার ঘাড়ে কী পাঁচটা মাথা গজিয়েছে ? ওর বাপকে এখনি একটা চিঠি লিখছি আমি। নিয়ে যাক মেয়েকে। এত বড় স্পর্ধা কিনা আমার কাজের সে বিচার করতে এসেছে ?

পরদিন সকালেই রাষ্ট্র হয়ে গেল উমাশংকর তাঁর মেয়েকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন। আর এদিকে সে খবর শোনার পর সুদীপ্তাও চলে এল কলকাতায়।···আর তার কিছুদিন পরেই—আজকে, এখানে সুদীপ্তা এসেছে নন্দিতার কাছে।

নন্দিতা সমস্ত শুনলো। শুনে বললে, তা হলে এসব খবর কাগজে উঠবে না ?

—কাগজে আর উঠলো কৈ ? সুদীপ্তা বললে, এখন—তোর খবরের মুখ চেয়েই কাগজগুলা লোকসান গুনছে। আমি তো পারলাম না। খবর ওঠাতে তুই পারিস কিনা, তাই দেখ।

নন্দিতা তখনো কী বলতে যাচ্ছিল।

নবেন্দু এল সেই আসরে।

কুড়ি

নকড়ি তো আধ ঘণ্টা পরেই পালালো। কেন বসলো না— সেই জানে।

রণজিৎ তাকে অনেক করে বুঝিয়েছিল, আজ রাত্রিটা থাকো, কাল যেয়ো। কিন্তু তার আর তর সইলো না। না, আজই যেতে হবে। দিদির নাকি অসুখ।

—কী অসুখ রে বাবা?

—সূতিকা।

—তা অসুখই যখন হল, এলি কেন এখানে?

—এলাম খবরটা দিতে।

—মানে ভাবাতে—এই তো? তা, ভালোই করেছ! নিষ্ঠুর হে, শুনে সুখী হলাম।

নকড়ি তো চলে গেল কিন্তু গৌরীও যদি এরকম করে চলে যেতে পারতো! দুর্ভাবনায়, দুঃশ্চিন্তায় সে যেন বড় বেশী দুর্মনাঃ হয়ে পড়লো।

রণজিৎ বললে, তোমার আবার কী হল? মুখচন্দ্র মলিন কেন?

—আপনার কথা ভেবে।

—আমার কথা তো ভাবতে তোমায় মাথার দিব্যি দেওয়া হয়নি।

—কিন্তু এবার আপনি গিয়ে তো আপনার বৌ ছেলে-মেয়েদের আনতে পারেন। বিলম্বে কাজ কী?

—বিলম্বে কাজ আছে বৈকি! সবুরেই তো মেওয়া ফলে! দাঁড়াও, আগে আমার বোনটার একটা ব্যবস্থা করি, তারপর তো বৌ! যা তোমার দুর্গার ছিরি, সে এলে তো এক ঘণ্টাও তোমায় টিকতে দেবে না, এসেই হয় তো মেরে ফেলবে!

ঠিক এই কথাটা—গৌরীও ভাবে। তবু বলে, খানিকটা আপনি মেরেছেন, বাকীটা না হয় আপনার বৌ-ই মারলো! অদৃষ্টে যার মার আছে, কে খণ্ডাবে বলুন? তাই বলে তো অবাঞ্ছিত অবস্থায় আপনার ঘর-দোর জোড়া করে রাখতে পারি না!

—তোমার সাধ্য কী আমার ঘর-দোর জোড়া করে রাখো?

রণজিৎ সিগারেট ধরায়। বলে, ভালো কথা, তোমার একজন প্রদীপদা আছেন না?

—ছিলেন্ তো এককালে, এখনো আছেন কিনা জানি না।

—তিনি কোথায়?

—তিনি কোথায় জিজ্ঞেস করার চেয়ে—গৌরী বলে, আমি কোথায় জিজ্ঞেস করাই সমীচিন। তার খোঁজ আমি রাখি না।

—কিন্তু তাকে আমার বড় দরকার। রণজিৎ বলে, তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই। দেখি কী করতে পারি।

—কেন, মারবেন নাকি তাকে?

শিশুর মতো হেসে ওঠে রণজিৎ। —মারাই কী আমার কাজ? এমনি কী আমি শক্তিমান যে শুধু মেরেই যাবো? মার খেতে পারি না? তোমার যদি ব্যবস্থা না করতে পারি—সেও কী আমার পক্ষে প্রচণ্ড মার খাওয়া নয়?

—আমার না হয় ব্যবস্থা করলেন কিন্তু বাবার?

—তাই তো! তিনি কোথায়?

দিদি বললেন, বিকালে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি।

—রাত্রি নটা বাজলো, এখনো ফেরেন নি। সে-কী!

রণজিৎ ছটফট করে উঠলো। গৌরীকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কিছু জানো?

—অন্য দিন তো বাবা পার্কে বেড়াতে যান শুনেছি। আজ কোথায় গেছেন জানি না।

—কিন্তু বুড়ো মানুষ, গাঁয়ে থাকতেন। এই জন্যেই তো ভয়। নইলে তিনি যেখানেই যান না, ভাবনার কী আছে?

ভাবনার আছে বলেই তো ভয়ও সেখানে···

রণজিৎ বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলো না।

—আর একদিনও এমনি : রণজিৎ বলে যেতে লাগলো, তিনি বাড়ি ফিরলেন না। তারপর, ফিরলেন তো ফিরলেন রাত্রি আটটায়। বললাম, কী ব্যাপার বলুন তো? সে কথা মনে আছে তোমার?

উত্তর দিল গৌরী : আছে বৈকি। বাবা গেছলেন গঙ্গার ঘাটের ঠাকুর হতে!

—আরে ছোঃ! ঠাকুর হতে চাইলে ওরা দেবে কেন? ঠুকরেই শেষ করে দেবে! দেশটা বাংলা বটে কিন্তু বাঙ্গালীর এখানে কী আছে? বিদ্যে থাকে কেরাণীগিরি করো। বিত্ত থাকে ব্যতিব্যস্ত হও। ব্যাপার তো এই!

রাত বাড়তে লাগলো।—

এ যেন রাত বাড়া নয়, চৌবাচ্চার জল বাড়া…

চারিধার—চারিদিক নির্জন হয়ে এসেছে। শুধু নির্জন নয়, নিস্তব্ধ! সেনানিবাসের নিস্তব্ধতা সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে সারা সহর জুড়ে। চৌবাচ্চা থেকে জল উপছে উঠছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে ঝাঁঝরিতে। তার ক্ষীণ শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায়। আর যা জলের শব্দ তাই যেন বুকের শব্দ! তাই যেন পাশের বাড়ির লোকের ঘুমের শব্দ।

অনবরত ঘুমের শব্দ আর বুকের শব্দ শোনো! কিন্তু জুতোর শব্দ কৈ? রাস্তায় একটা জন মানুষের জুতোর পদক্ষেপও তবু আশা জাগায়। তবু সান্ত্বনা দেয়, মানুষটা হয়তো আছে, মানুষটা হয়তো আসছে। দুএকবার রাস্তায় বেরিয়ে দেখতেও ইচ্ছা করে। কিন্তু এ যেন দুর্ধর্ষ কালরাত্রির দুর্মদ কাঠিন্য। মহারাত্রির তপস্যা, যা—কঠিন, নিষ্ঠুর হয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়, মানুষটা নেই, মানুষটা আসেনি। মানুষটা আসবে কিনা, তাও স্থিরতাবিহীন! কলকাতা সহর। শেষ ট্রাম পর্যন্ত ডিপোয়

ফিরে গেছে। ট্রাম কনডাকটার পর্যন্ত হয়তো আর জেগে নেই। বাসায় ফিরে মৌজ করে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু একি? মানুষটা গেল কোথায়? পুলিসে ধরে নিয়ে গেল না তো? গুণ্ডায় বুকে ছুরি বসিয়ে দিল না তো? গঙ্গায় ডুবে গেল না তো? দুঃশ্চিন্তা কতো রকমের হয়। দুর্ভাবনায় শেষ কোথায়?

ভয়ে যেন কাঁদতেও ভুলে গেল গৌরী!

ভয়ে সে কাঁচ, ভয়ে সে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।

ভয়—রণজিৎও যে কম পায়নি, এমন নয়। তবু, পুরুষ হয়ে তার পক্ষে দুর্বলতা দেখানোর মতো ভীরুতা আর কী হতে পারে? তাই রাত্রি যখন দুটো, রণজিৎ গৌরীর পিঠে সস্নেহ-হাত বোলালো, শুয়ে পড় আজ। ভোর হয়ে এল বলে! ভেবে কিছু লাভ নেই। কাল এর ব্যবস্থা যা হয় হবেই। আমি যখন আছি ভয় নেই তোমার…

ভয় নেই। কিন্তু ভরসাই বা কি আছে? অকালে তার মা গেছেন, আত্মীয় বলতে জগতে কেউ আছে কিনা তাও তার জানা নেই। মেয়ে হয়ে যা কলঙ্ক কুড়োবার নয়—সে কুড়িয়েছে! ফের তার বাবাও যদি যান।

তার দুর্দিনের, তার দুঃসময়ের বড় স্নেহময়, বড় সদাশয় যে বাবা…

গৌরী কেঁদে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। আর তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন দিদি, সান্ত্বনা দিতে লাগলো রণজিৎ।

ঘড়ির কাঁটা ঠিক ঘুরে চললো। দুটো থেকে তিনটের ঘরে

এল ছোট কাঁটা। আর আওয়াজ হল—তিনটে। ঢং....ঢং...
ঢং...একটা ঘড়িই শুধু বাজলো না। আশে-পাশে যতো ঘড়ি
ছিল, দিনের বেলা যারা তারার মতো অদৃশ্য, অস্তিত্বহীন, তারাও
একে একে সব সাড়া দিতে সুরু করলো। কেউ দুমিনিট আগে,
কেউ দুমিনিট পরে, কেউ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই!

যতো মানুষ—ততো মত! যতো ঘড়ি—ততো বাজনা!

হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতেই চাপা রইলো। ঢাকা রইলো।
দিদি খাননি। রণজিৎও খেতে বসবার অবসর পায়নি। আর
গৌরীর কথা তো ছেড়েই দাও। যেখানে যেমন তরকারিটি
ছিল, ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা আলুসিদ্ধ, মাছের ঝাল, সব তেমনি
রইলো। মানুষ তাতে দাঁত ফোটালো না কিন্তু ফোটাতে
পারলো অপর এক প্রাণী! যেখানে বড় জীবকে দিয়ে উদ্দেশ্য-
সাধনে বাধা আছে, ভগবান সেখানে সৃষ্টি করেছেন ছোট জীব,
ছোট জীবন? পিঁপড়ে আর আরসোলার তাঁবে রইলো ভাত,
ডাল। মানুষের অভুক্ত ভোজ্যবস্তু।

দুঃখের রাত্রি যেন আর শেষ হতে চায় না

এমনিতে কতোদিন শুতে না শুতেই ভোর হয়ে গেছে।
ঘুম ভাঙতেই দেখা গেছে প্রসন্ন-প্রভাত! কিন্তু আজ যেন
এ-রাত্রির শেষ নেই! অলঙ্ঘ্য, অদম্য এই রাত!

কে যেন চীৎকার করে। কারা যেন এগিয়ে আসে।

এ কারা? এ কারা?

—বল হরি, হরিবোল। বলহরি, হরিবোল…

কী বিশ্রী, কী হৃদরবিদারক এই ডাক। রাত্রির বুকে—শুনলে কী ভয় করে না? ভয় আবার করে না! ছিঁড়ে পড়তে চায় হৃদয়। হিম হয়ে আসতে থাকে অন্তঃকরণ।

দাঁতে দাঁত লেগে যাবার মতো হয় গৌরীর। শরীরটা তার থর থর করে কাঁপতে থাকে। রণজিৎ বলে, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

অনেক কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করে গৌরী—ও কারা?

—ও কাদের মড়া যাচ্ছে আর কি।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রণজিৎ জবাব দেয়। যেন মড়া যাওয়ার মধ্যে কিছু আশ্চর্য নেই। যেন নিতান্তই স্বাভাবিক, সহজ একটা ঘটনা। তবুও মনে মনে সে বলে, মড়া যাওয়ার কী সময় অসময় নেই?

—বলো হরি, হরি বো—ল।

মড়াটা পার হয়ে যায় অবশেষে তাদের বাড়ির পথ দিয়ে।…

আর কোনো শব্দ নেই। আর কোনো কিছুই শোনা যায় না।

•

দেখতে দেখতে মহারাত্রির মহরৎ-ও শেষ হয়ে আসে।

একটা লোক ছুটে আসে গ্যাসপোস্টের পানে। চট করে গ্যাসের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যায়। মোরগ ডেকে ওঠে। ট্রাম-কনডাকটার কাজে যায়। রাস্তায় জল দেওয়া সুরু হয়। টিনের ঠেলা গাড়ি বার হয় ময়লা সাফ করতে।

ছাগল চলে গলায় ঘণ্টা বাঁধা। ছাগলওলা চীৎকার করে—ছাগলত্বধ লেবে এস মা……

আকাশে অরুণোদয়……

বেলা নটা বাজলো। উমাশংকর তবুও ফিরলেন না।

অস্থির, ব্যতিব্যস্ত হয়ে রণজিৎ খুব খানিকটা ঘুরে এল পথে-পথে। কিন্তু ঘুরে আসাই সার! এ পল্লী নয়—সহর। এ কুসুমপুর নয়—কলকাতা। একটা লোককে গুম করে মেনহোলের মধ্যে যদি ফেলে দাও, সহজ নয় তার খোঁজ পাওয়া! একটা লোককে হত্যা করে গঙ্গায় যদি ভাসিয়ে দাও, সহজ নয় তার সন্ধান করা! কী হয়েছে—কে জানে!

ক্লান্ত, মৃতপ্রায়ের মতো ফিরে এল রণজিৎ বাসাতেই! আর তার এই অকৃত্রিম আন্তরিকতা দেখে—কষ্ট দেখে গৌরীও এখন কষ্ট পেল। মানুষটা যে খুব খারাপ তা আর ভুলেও সে মনে করতে পারলো না। মানুষ মাত্রেরই তুর্বলতা আছে। হয়তো ঝোঁকের মাথায় সে একদিন যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড করে ফেলেছিল, কিন্তু এও সত্য, মনুষ্যত্বের প্রেরণাতেই সে আজ তার বড় বন্ধু হয়েছে। তাকে নয়, তাদের আশ্রয় দিয়েছে। আশ্রয় নয়, আশ্বাস দিয়েছে। তার শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতেরও বটে। আর এই তুর্দিনে রণজিতদা ছাড়া তার গতিও সে দেখতে পেল না।

গৌরী বললে, আপনি বড় ক্লান্ত। কিছু মুখে দিন এবার।

অদৃষ্টে যা আছে, সে তো হবেই। আমার জন্যে আর কতো কষ্ট পাবেন আপনি?

সে কথা রণজিৎ শুনলো বলে মনেই হল না।

রণজিৎ বললে, আজ আর অফিস যাবো না। একবার বরং থানায় যাই, খবরটা দিয়ে আসি।

—কিন্তু তার আগে একটু চা খান।

—তুমি কী খেয়েছ সকাল থেকে? রণজিৎ প্রশ্ন করলো।

—আমি মেয়েছেলে। কিছু না খেলেও মরবো না কিন্তু আপনার জীবনের দাম আছে।

—দাম কারো জীবনেরই কম নয় গৌরী। কম শুধু বোঝবার লোকেরই।সংখ্যাটা। আমি বলছি, তুমি জল খাও। আমি যতোক্ষণ আছি, আমার বোনকে বাঁচাবোই। মনে রেখো—এটা আমার শ্বশুরবাড়ি নয়, নিজের বাসা। আমার বাসার একটা পবিত্রতা আছে। তোমাকে তা অক্ষুন্ন রাখতে হবেই।

রণজিৎ পায়ে শ্লিপার গলিয়ে ফের বেরুতে যাচ্ছিল। দিদি এক কাপ চা এনে দাঁড়ালেন। আর ঠিক এই সময় কে একজন ভদ্রলোক বাইরে থেকে ডাকলো—রণজিৎবাবু আছেন?

রণজিৎ বললে গৌরীকে—কে ডাকছে, দেখো তো।

গৌরী আড়াল থেকে উঁকি মেরে একবার দেখেই রণজিতের কাছে ছুটে এল।—প্রদীপদা এসেছে।

—তাই নাকি? মরুভূমির মধ্যে এ-যেন মরুদ্যান। দারুণ

গ্রীষ্মে এ-যেন বর্ষার বিচূর্ণ-বারিধারা। এতদিন পরে প্রদীপদা এসেছে? ডাকো…ডাকো…

দুঃখের মধ্যেও আরাম করে বসবার লোভটুকু সম্বরণ করতে পারলো না রণজিৎ।

রণজিৎ বড় আশা করেছিল—প্রদীপ আসুক। প্রদীপ এসে তাকে মুক্তি দিক। প্রদীপ এসে নিয়ে যাক—তার পরিত্যক্ত প্রাণকেন্দ্রের প্রখ্যাত পরমায়ু।

একুশ

প্রদীপকে আর ডাকতেও হল না। .

নিজেই সে ঢুকে পড়লো বাড়িতে। আর বাড়িতে নয়—ঘরে। যে ঘরে—যে চেয়ারে রণজিৎ বসেছিল। বসেছিল এলোমেলো মাথায়। চোখের কোলে নিয়ে কালিমা—বিনিদ্র রাত্রির। মুখে নিয়ে দাড়ি—সন্থ না-কামানোর।

অসুখে প্রদীপ রোগা হয়েছে বটে কিন্তু দেখলে তাকে এখন বোঝা যায় না, সে রোগগ্রস্ত, শক্তিহীন! মালকোঁচা মারা অবস্থাতেই সে ঢুকলো ঘরে। হাতে তার ছিল একটা ছড়ি। আর সেই ছড়ি ঠুকেই সে প্রশ্ন করলো, আমি জানতে চাই, এখানে রণজিৎবাবু কে আছেন?

মুহূর্তের মধ্যে যে এমন এক কাণ্ড হয়ে যাবে—কে জানতো?

রণজিৎ শুধু বলেছিল, আপনি যাকে খুঁজছেন, আমিই সেই···

আর তারপরই প্রদীপের উদ্যত হাত আর মানা মানলো না। সেই ছড়ি দিয়েই সে আষ্টেপৃষ্ঠে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেরে যেতে লাগলো রণজিৎকে।

কাল সমস্ত রাত রণজিৎ অন্নজল মুখে দেয়নি। আজ সকালে—এখনো পর্যন্ত সে চা বা জলখাবার ছোঁবার অবকাশ পায়নি। আর তারই উপর পশুর মতো আক্রমণ চলতে লাগলো।

রণজিৎ মারতে পারতো প্রদীপকে। প্রদীপকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে পথে বার করে দিতে পারতো। কিন্তু কেন কে জানে, সে শুধু প্রতিরোধ করে যেতে লাগলো। নখদন্তহীন পশুর মতো প্রতিরোধ!

তারই বাড়িতে এসে একজন মারছে আর সে শুধু প্রতিরোধ করছে! প্রতিরোধ—কিন্তু প্রতিবাদ নয়। রণজিতের হাত ফেটে গেল, রক্ত আর বাধা মানলো না। ফিনিক দিয়ে সেটা আত্মপ্রকাশ করলো আর সেই দৃশ্য দেখেই ঝাঁপিয়ে—লাফিয়ে পড়লো গৌরী প্রদীপের উপর!

—তোমায় কে বলেছে এখানে এসে গুণ্ডামি করতে?

নিমেষে প্রদীপ প্রতিনিবৃত্ত হল। তার বুক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সংঘাতে তখন ফুলে ফুলে উঠছে।

—কে বলেছে? প্রদীপ চীৎকার করে উঠলো, যাকে মারছি তার স্ত্রী নিজমুখে আমার কাছে সব স্বীকার করেছে। শুধু স্বীকার করেনি, এর কী করে শাস্তি দিতে হয়, তাও আমায় শিখিয়েছে!

—আর তাই তুমি, একজনের বাড়ি বয়ে অপরের প্ররোচনায় এসেছ গুণ্ডামি করতে?

—গৌরী! চীৎকার করে উঠলো প্রদীপ। তোমার এত অধঃপতন হয়েছে, আমি জানতাম না আমার ধারণা ছিল, তুমি ভালো। কিন্তু চাক্ষুস তোমার এই অবনতি দেখে লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে আসছে! ছিঃ গৌরী ছিঃ…

—অপরকে ধিক্কার দেবার আগে নিজেকে ধিকৃত করো।

গৌরীও যেন মরিয়া।—তোমারও এই অধঃপতন দেখে লজ্জায় আমিও কম ছোট হয়ে যাচ্ছি না! রণজিৎদা যেমন তোমার পথ চেয়ে ছিল, তার উপযুক্ত প্রতিফলই তুমি দিলে বটে!

—রণজিৎদা আমার পথ চেয়ে ছিল না। ছিলে তুমি। সামান্য এক গরিবের মেয়ে—তাই ছুটে ছিলে চাঁদে হাত দিতে! উঃ, খুব শিক্ষা হল আমার! মেয়েরা কী বেইমান।

প্রদীপ আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না। ঝড়ের মতোই যার আগমন, ঝড়ের গতিতেই তার তিরোধান। আর ছুটে পালাবার সময়, এমন কি—তার হাতের ছড়িটা পর্যন্ত সে নিয়ে যেতে ভুলে গেল!

—এ তুমি করলে কী গৌরী। রণজিৎ হাতের রক্তটা চেপে ধরেই বলে উঠলো—কেন তুমি ওকে চটাতে গেলে বলো দেখি? এটা কী ভালো হ'ল?

—এটা ভালো হল না তো, কোনটা ভালো হত শুনি? আপনাকে খুন করে গেলেই কী সেটা ভালো হত?

—আহা, খুন তো এখনো করেনি!

এত যন্ত্রণার ভিতরও রণজিতের মুখে হাসি। ধন্য লোক বটে। আর এতক্ষণ পরে—দুচোখ দিয়ে ধারা নামলো গৌরীর। গৌরী বসলো কাঁদতে। ফুলে ফুলে, কেঁপে কেঁপে সে কাঁদতে লাগলো—চোখে আঁচল চাপা দিয়ে।

প্রদীপ তীরবেগে রণজিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল একি বিপ্লব? অন্তরকে পুড়িয়ে দিল একি বহ্নি? তবে কী—মিথ্যাই তাকে—মরীচিকার মতো ছুটিয়েছে? তবে কী—মোহই তাকে মোহিনীমায়ায় অন্ধ করে রেখেছিল? গৌরী—গৌরী আর তার নয়? পাত্রে পড়ে জলের রং গেল বদলে? যে গৌরীকে সে একদিনও ভোলেনি, ভুলতে পারেনি, সেই গৌরীই আজ তাকে এত বড় আঘাত দিল? চুরমার করে দিল তার জাগ্রত স্বপ্ন! টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিল তার স্নেহ-মমতার ঝাড়বাতি!

কেন গৌরী লড়তে এল ওই লোকটার হয়ে? কেন সে পারলো না হাততালি দিতে? তাকে আরো উৎসাহিত করতে?··· তাকে আরো ঠেলে দিতে শত্রুনিধনে? প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ঘটনা—দুর্গা তাকে জানিয়েছে। জানিয়েছে সেই অন্ধকার রাত্রে তার নিজের ঘর থেকে নেমে এসে। এত বড় শত্রুতা যে রণজিৎ করলো, যে রণজিৎ টেনে আনলো গৌরীকে তার কুলায় থেকে অকূলে, তাকে হত্যা করে ফাঁসী গেলেও যে মনের রাগ মিটতো না। আর সেই রণজিতেরই পক্ষাবলম্বন করলো গৌরী! প্রদীপ গৌরীর আপনার হল না। হল ওই লম্পট, দুশ্চরিত্র একটা জানোয়ার? যে—যে তার নিজের স্ত্রীর পর্যন্ত মুখ চায়নি, একটা বেকার—বদমাস হয়ে বাস করছে ভাস্বর ভদ্রসমাজে। ভদ্রসমাজে বাস করছে না, ভাঁওতা দিচ্ছে ভদ্রসমাজকে। ভদ্রসমাজে মুখ দেখাচ্ছে না—দেখাচ্ছে মুখচ্ছদ্ম!

রাগে দুঃখে প্রদীপ গিয়ে একটা পার্কে বসে পড়লো। আর শুধু বসলো না, শুনতে লাগলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তার অস্থির, উত্তেজিত হৃৎপিণ্ডের দ্রুত পক্ষধ্বনি। মাথার সমস্ত চুলগুলোকে ছিঁড়ে ফেললেও তার রাগ যেতো না। অথচ রাগ—পুষে রেখেও লাভ নেই।

অনেকক্ষণ পরে সে ভাবলো—গৌরী যদি তার নাই-ই হয়, তবে তার করবার কী আছে? গৌরীর জন্য সত্যই সে কী করেছে? গৌরীর মা অকালে মারা গেলেন। এ-খবর দুর্গার মুখেই শুনেছে সে সেরাত্রে। গৌরীর মাকে পোড়াবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যায়নি। আসেনি ব্রাহ্মণ—এসেছে শূদ্র! তখনো যদি প্রদীপ উপস্থিত থাকতে পারতো! সমাজের বুকে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে তার নিজেরই বাবা রায় দিয়েছেন, ওদের একঘরে করা হোক। তখনো যদি প্রদীপ উপস্থিত থাকতে পারতো! কিন্তু তার-ই বা দোষ কী? দোষ কারো নয়। দোষ তার অদৃষ্টের। অদৃষ্টের ঘুর্ণিবায়ুর। ভাগ্য তাকে উঠতে দেয়নি, ফেলে দিয়েছে। ভাগ্য তার প্রতি প্রসন্ন হয়নি। ভাগ্য তাকে পরিহাস করেছে। পদে পদে যেখানে এত বাধা, পর্বত প্রমাণ যেখানে এত বিঘ্ন, রুক্ষ দিনের যেখানে এত দুঃখ, প্রদীপের সাধ্য কী সেখানে পথ কেটে এগুতে পারে? আপন পথের—সে হতে পারে প্রোজ্জ্বল পথকার?…প্রখ্যাত পথশিল্পী?

কিন্তু জীবন থাকলেই পথ থাকে। পথ থাকলেই তার পাথেয়র প্রয়োজন। গৌরী গেছে। গৌরী যাক। নন্দিতা

আছে। নন্দিতা আসুক। নন্দিতা নেমে আসুক গোধুলির সমুদ্ভাসিত সমুদ্র সাঁতরে তার অত্যায়ত অন্তরের অভ্রংলিহ নিরালায়। তার জীবনপাত্র ভরিয়ে তুলুক যৌবনের বাদল-উচ্ছল নির্ঝর ঝর্ঝরে। এলায়িত-কুন্তলা নন্দিতাকে সে হারায়নি। অনেকদিন—অনেকরাত্রে সে প্রবল জ্বরের তাড়নার মধ্যেও লক্ষ্য করেছে অনিমেষ মূর্তি নন্দিতা চেয়ে আছে ব্যাকুল দুটি চক্ষু মেলে তার পীড়িত মুখের দিকে। আপনাকে সে গোপন করলে কি হবে, হৃদয় যে তার আঁখির ভাষায় উন্নিদ্র। নন্দিতা দিয়েছে কপালে অডিকলনের আসার-আস্তরণ। সেবায়-যত্নে নন্দিতা তার চোখে এনে দিয়েছে স্বপ্নের সুরলোক। সীমাহীন সমুদ্রের সুগভীর সুরমা। সমুন্নত সম্পৎ। নন্দিতা লীলাভরে তাকে ছুঁড়ে দেয়নি। নন্দিতাই দিয়েছে তার হাতে তুলে লালিত্যের লীলাকমল! সেদিনও চলে আসবার সময় নন্দিতা বলেছে, টাকা পয়সার দরকার থাকে তো বলুন। আর শুধু মুখেই বলেনি, দিয়েছে এক কথায় পাঁচখানি পাঁচ টাকার নোট হাতে তুলে। সেকথা কী এত সহজেই সে ভুলে যাবে? আর এত সহজে ভুলে যাবার জন্যই কী তার জন্ম নেওয়া?

মুহূর্তমাত্রও আর দ্বিধা নয়।—

কঠিন কালক্ষেপণও এখন অসহ্য কষ্টকর!

গিয়ে দাঁড়ালো প্রদীপ নন্দিতারই আবাসস্থলে। আর নন্দিতা এসে তাকে অভ্যর্থনা করলো না, করলো নবেন্দু।

নবেন্দুর সেদিন কী কারণে যেন কলেজ বন্ধ। নবেন্দু ঘরেই ছিল। সে-ই আনলো—বসালো—কথা বললে প্রদীপের সঙ্গে।

—আরে, এসো এসো। বোসো বোসো। তারপর…তুমি তো ভয়ানক রকমের চাপা লোক হে দেখছি।

—কী রকম ?

—কী রকম মানে ? তুমি তো খুন করতেও পারতে দেখছি। খুন যে করোনি—এ নেহাৎই আমাদের ভাগ্য।

নবেন্দু এসব বলে কী ? মুহূর্তের মধ্যে প্রদীপ চঞ্চল, সংশয়ালু হয়ে উঠলো।

—এরকম কথা বলার তোমার অর্থ কী, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

—অত চোটছো কেন ? মারামারি করে আসছো নাকি ?

নবেন্দু না হেসে থাকতে পারলো না।

আর, আরো জ্বলে উঠলো প্রদীপ।—মারামারি করবার দরকার বুঝেছি বলেই করেছি। সে কৈফিয়ৎ কী তোমায় দিতে হবে ?

—আমাকে দিতে হবে না কিন্তু তোমার বিবেককে দিতে হবে।

—নবেন্দু, তুমি বন্ধু বলেই কী বাড়িতে পেয়ে তোমার অপর এক বন্ধুকে এ ভাবে অপমান করবে ? বুঝে দেখ দেখি—ব্যাপারটা ভালো করছো কিনা।

কী কথার কী জবাব। যেন আকাশ থেকে পড়লো নবেন্দু।

—তুমি বন্ধু, একথা কে বলেছে? তুমি তো আমার আত্মীয় হে।

—আত্মীয়? কিসের আত্মীয়? যাও, যাও, আর রসিকতা করতে হবে না। আমি চললাম।

একেবারে সত্যই প্রদীপ চললো। আর এই দেখে নবেন্দু যে কী করবে কিছুই ভেবে পেল না। যখন প্রদীপ দরজার কাছে বরাবর বাস্তবিকই চলে গেছে, সে আর পারলো না। ছুটে গেল। প্রদীপকে ধরলো।

—কী হয়েছে বল দেখি? রাগ কোরো না, তোমাকে যেন কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছে। এসো—বসবে এসো, আমাকে খুলে বলো—কী হয়েছে।

প্রদীপ বললে তুমি তো সবই জানো, ইয়ার্কী কচ্ছো কেন?

—আপন গড্ বলছি। নবেন্দু বললে, আমি কিছু জানি না। শুধু এইটুকু জানি, সুদীপ্তাদি এসেছিলেন। তারই কাছ থেকে শুনলাম, তুমি তার দেওর। তা, এটুকু তো তোমার বলা উচিত ছিল আগে!

—কে এসেছিলেন? বৌদি?

প্রদীপ না ফিরে পারলো না। আর আগাগোড়া সেই সব বৃত্তান্ত শুনে সে যেন নুনের পুতুলের মতো ডুবে গেল নুনের সরোবরে!

প্রদীপ বললে।—সব বললে, তার আজকের এই বৃত্তান্ত।

আর সেই সঙ্গে একথাও সে বলতে ভুললো না—তার ছড়িটা সে ফেলে এসেছে রণজিতের বাড়িতেই।

নবেন্দু শুনে বললে, তবেই তো ওই ছড়িটাকেই সাক্ষী করে যদি রণজিৎ যায় থানায়? রণজিৎ যদি নালিশ করে? রণজিৎ যদি হাসপাতালে যায়? তোমার তো জেল হয়ে যাবে। রণজিৎ অন্যায় করেছে, তাও মানি। কিন্তু তুমিও তো তার চেয়ে কম অন্যায় করোনি মনে হচ্ছে। একজনের অন্তঃপুরে ঢুকে দিন দুপুরে গুণ্ডামি। এ তোমায় কে করতে বলেছে? আইন নিয়েছ নিজের হাতে?

ক্রমে ক্রমে যেন সম্বিৎ ফিরে আসাছল প্রদীপের। সম্বিৎ নয়—সচেতনতা। তবুও সে দেখাতে পারলো না তার দুর্বলতা। প্রকাশ করলো না আপন ভীরুতা।

নবেন্দু বললে, আছ কোথায় এখন?

—ভাবছি তো তোমাদের এখানেই থাকবো। আর যখন তোমরা আমার আত্মীয়-ই হয়ে গেছ।

—অসম্ভব। সুদীপ্তাদি থাকতে আমরা তোমায় ধরে রাখতে পারিনা। বিশেষ্ করে যখন তুমি পুলিস-কেসের একজন আসামী। তা ছাড়া, ওখানে থাকার তোমার সুবিধা এই—দিদির বাবা একজন পুলিস অফিসার। চাই কী, বাঁচালেও বাঁচাতে পারেন। আর এখানে থাকার অসুবিধা এই, থাকো কিন্তু খেতে পাবে না। ঠাকুর চলে গেছে, নন্দিতাও নই।

—নন্দিতাও নেই ?

বুকটার ভিতর কারা যেন মার্চ করে চলে গেল। মার্চ করে নয়—মাড়িয়ে। মোচে পাক দিয়ে নয়—মোচড় দিয়ে।

—নন্দিতাও নেই ? কেন ? প্রদীপ জিজ্ঞেস না করে পারলো না।

—রেঙ্গুন থেকে মিনি সাহেব এসেছেন। নবেন্দু বলতে লাগলো ঃ মিনি সাহেবের ওপর বাবার অগাধ স্নেহ। মায়ের ও তাই। বাবার ইচ্ছে, ওর সঙ্গে নন্দিতার বিয়ে হোক। আর মায়ের ইচ্ছে, ওর সঙ্গে নন্দিতার বাসর হোক। নন্দিতা তাকে পেয়ে এখন ভুলে গেছে পৃথিবী, পৃথিবীর পরিধি। কোথায় জু-গার্ডেন আর কোথায় জিমখানা—দু'জনে এখন এই সব করে বেড়াচ্ছে। কাজেই, কী করে আর বলি—নন্দিতা আছে ? অতএব, নন্দিতাও নেই।

—বলো কী হে ? যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়তে লাগলো প্রদীপ। আর একে সোজা পড়া বলে না। ভাঙা এরোপ্লেন থেকে ঝুলতে ঝুলতে—বেঁকে বেঁকে—ঘুরে ঘুরে—টুকরো টুকরো হয়ে পড়া। আর কোনো কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলেই প্রদীপ শেষ অবস্থায় খাবি খেল ঃ তা, নন্দিতা পড়ছে না ?

—রামোঃ। পড়বে কী দুঃখে ? মেয়েরা কী সাধে পড়তে চায় ? মেয়েদের বই পড়া নয় হে—বই পড়া নয়। প্রেমে পড়া। প্রেমে পড়লে—বই। ছোঃ।

প্রদীপের পলতে পুড়ে এসেছিলো। তাই বললে, অনেক সময় নষ্ট করলাম তোমার। ক্ষমা কোরো।

আর পথে যখন সে নেমে এল, তখন তার না আছে তেল, না পলতে।

মৃণ্ময় প্রদীপেরও সান্ত্বনা ছিল কিন্তু মানুষ প্রদীপ আজ সর্বহারা। সর্বহারা নয়—নিরালম্ব। নির্ভরতায় নীলাম্বুজ নয়। নির্বিশেষে নির্বিকল্প।

সকলেরই পথ আছে কিন্তু প্রদীপ দেখলো সে যেন আজ পথহারা। পৃথিবীর শেষ সীমানায় সে এসে দাঁড়িয়েছে। যার পরে আর মাটি নেই। মাঠ নেই। শুধু উত্তাল তরঙ্গ মালা…শুধু বিপুল বীচি-বিভঙ্গ আর নাগিনীদের নির্ভংসিত বিষাক্ত নিশ্বাস।

বাইশ

ঠাকুর-দেবতাকে আর কতো মানত করবেন মহামায়া ?

ফুলের মধ্যেও কীট জন্মায়। বিশ্বাসের মধ্যেও অবিশ্বাস এসে বাসা বাঁধে। অবিশ্বাসের মেঘ সঞ্চারিত হয়, বিস্তার লাভ করে—বিশ্বাসের আকাশ জুড়ে !

কদিনের ভিতর কতো সর্বনাশই না হয়ে গেল ! ছেলে হল নিরুদ্দেশ। ত্রিলোচনা মরে গিয়ে ব্যথা জুড়োলেন। আর শেষ অবস্থায়, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—নারায়ণের সেবার যিনি অচঞ্চল অধিকারী—তাঁকেও মেয়ের হাত ধরে দরিদ্র-নারায়ণরূপে হতে হল বিবাগি। আর তাঁর চোখের জল ফেলার মূলে—কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না—তাঁর স্বামীরও ইঙ্গিত আছে ষোলআনা ! এ জিনিসটা কী ভালো হল ? এতে কী মঙ্গল হবে তাঁর ? তাঁর স্বামীর ? তাঁর ছেলের ? মহামায়া যেমন গৌরীদের বুঝতেন—আর কে অমন বুঝতো ? তিনিই না একদিন কথা দিয়েছিলেন গৌরীর মাকে, গৌরীকে তিনি পুত্রবধূ করবেন ? তাঁর ছেলে প্রদীপ কলকাতা থেকে এসেই আগে ছুটতো গৌরীদের বাড়ি। একি তাঁর অজানা ছিল ? জেনে-শুনেও তবু তিনি কোনো ব্যবস্থা করেছিলেন কী ? গরিবের বয়স্থা কন্যা থাকলে বিপদ একদিন তার আসেই ! উচিত ছিল না কী তাঁর, এ বিপদের কথা ভাবা ? এ বিপদ

ঘটবার আগেই কোনো কিছু প্রতিকারের কথা চিন্তা করা। চিন্তা কী তিনি করেছিলেন ?

করেছিলেন। কিন্তু করেও যেখানে উপায় নেই, সেখানে আর তিনি কী করতে পারেন ? ঠাকুর-দেবতা ছাড়া তাঁর ভরসা-স্থলই বা কী ছিল ? স্বামী তাঁর বশ নন। স্বামী হচ্ছেন জঙ্গী-মনোভাবাপন্ন। সৈনিক। সংসারে থাকেন তবু মন তার সৈন্যের মতো ! সংসারী হবেন অথচ স্ত্রীর কথা শুনবেন না ! আর যদি স্বামীই না শুনলেন, জগৎ-স্বামী শুনবেন কেন ?

তাই প্রকৃত শাস্তিই হয়তো হয়েছে। ছেলে গেছে। এক বৌ—তাও চলে গেল ! বৌ চলে গেছে, এতে তিন খুশিই হয়েছেন। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে তিনি তাকে বলবেন না। এখন হাড় কখানা মহামায়ার সার হয়েছে। মহামায়া ভাবেন, এবার যেতে পারলেই ভালো হয় ! কে কার ছেলে ! কে কার মা ! শুধু দুদিনের মায়া বৈ তো নয় ! কিন্তু দুদিনের মায়াটাই কী সত্য ? সত্য নয়, প্রদীপকে কাছে বসিয়ে সেই খাওয়ানো ? প্রদীপকে নিয়ে শোয়া ? প্রদীপকে পড়ানো ? প্রদীপকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা ? কোথায় গেল সেই সুদীপ্ত, সবুজ দিনগুলি ? সেই সবুজের উত্তরীয় বিছানো সহজ পথ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দগতি ? মায়ের বুক—শীতের অপরাহ্ণে, সুপারি গাছের মতো শিরশির করে ওঠে ! এ যেন মুখাগ্নি করার প্রথম অবস্থা। যতো কষ্ট—যতো শোক যেন ঐ সময়েই। তারপর একান্ত প্রিয়জন—অন্তরের অন্তরতম, নয়নের নয়নমনি—পুড়ে পুড়ে ছাই

হতে থাকবে। ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে এক রাশ আগুন। আগুনের আঙরা। ছোট সংকুচিত দেহটা পোড়া কাঠের ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়বে কালো, ময়দার পুতুলের মতো!

আর ভাবতে পারেন না। আর ভাবতে পারেন না মহামায়া।

চোখ তাঁর জলে ভরে আসে। সরে আসেন—সরে আসেন তিনি, আস্তে আস্তে ঘরের দেওয়ালের সামনে। দেওয়ালে টাঙানো বিরাট একখানি ছবি। পৌরাণিক দেব-দেবীর নয়। মানুষরূপী নারায়ণেরই। সরলতার, সান্ত্বনার, শান্ত ভাবেরই প্রতিমূর্তি। যে মূর্তি আজ স্থলে-জলে, সমুদ্রে-অন্তরীক্ষে, সাগর-পারে শান্তিস্থাপনারই আশীর্বাদ বহন করছে। আশীর্বাদ নয়—ঐকান্তিক শুভ-ইচ্ছা। সেই মূর্তি—পরম-পুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের। আর সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে মহামায়ার ধ্যান-লোকে—যোগনেত্রে দক্ষিণেশ্বরের দিব্য-কালীমন্দির···রৌদ্র মাখানো উদার গঙ্গার তটভূমি···বেলুড় মঠের বিস্তৃত দেবালয়···

মহামায়া সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।···

আর এর ঠিক দুদিন পরেই। মহামায়া গেলেন সন্ধ্যায় পূজার ফুল তুলতে। গেলেন নিজেদেরই বাগানে ফুল তুলতে। আর একটু পরেই ফিরে এলেন কাঁপতে কাঁপতে। কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে অসহ্য যন্ত্রণায় পড়লেন লুটিয়ে। লুটিয়ে পড়লেন বাড়ির সিমেণ্ট করা চত্বরের উপর।···

আর তার ঠিক এক মিনিট পরেই বীরেন্দ্রকিশোর ফিরলেন বেড়িয়ে। এক মিনিটও হত না। হয় তো সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতেন তিনি। কিন্তু না, দরজার সামনে ঢুকতে গিয়ে তাঁকে থামতে হল।

একটা কদাকার, মিশমিশে কালো কেউটে এঁকে বেঁকে—এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে ফুলবাগান থেকে আমবাগানের দিকে। আর যখন তিনি মহামায়াকে প্রশ্ন করে জানলেন, কী হয়েছে, তখনি ব্যাপারটা তাঁর বুঝতে আর বাকী রইলো না।

তিনি আর একটি কথাও বললেন না। শুধু উপরে সন্দীপের ঘরের ধারে গিয়ে খানিক দাঁড়ালেন। সন্দীপ তখন সহসা রোগী দেখতে বেরিয়েছিল। রামকে ডাকলেন। বললেন, সন্দীপকে খবর দাও।

তারপর সাপও গর্তে লুকালো আর বীরেন্দ্রকিশোরও আপন ঘরে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বসলেন।

এ অন্য কিছুর বিষ নয় যে ওষুধ দিয়ে বার করে দেওয়া যায়। একেবারে বিষাক্ত, ভয়ঙ্কর কাল সাপের।

সন্দীপ যখন এল, মহামায়া মুর্ছিত। পায়ের চেটোর একটা ধার দিয়ে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরেছে। সঙ্গে সঙ্গে হলেও ফেটি বেঁধে দেওয়া যেতো। ক্ষতস্থান ধুয়ে-মুছে পায়ের আশ-পাশগুলো ছুরি দিয়ে কেটে দেওয়া চলতো। বিষ বার করে দেওয়ার সুযোগও মিলতো। কিন্তু সে সময় এখন উত্তীর্ণ। সে বিষ এখন পায়ে নয়, মাথায় গিয়ে উঠেছে। মুখ দিয়ে থুতু

নয়, গাঁজলা বেরুচ্ছে মহামায়ার! আর সে গাঁজলা অন্য রঙের নয়! নীল। সমুদ্রমন্থনের বিষের মতো। আর যতো বিপদ এই রাত্রিতেই। রাত্রি না এলে কালরাত্রি—তার নাম হবে কেন?

চিকিৎসা-শাস্ত্রের দ্বারা যতোখানি করা যায়, যতোখানি নয়—যতোটুকু, তার কোনোই ত্রুটি রাখলো না সন্দীপ। কিন্তু তাতেও যখন সে বিফল হল, প্রমাদ গণলো। মিথ্যা মনে হল তার শিক্ষা, মিথ্যা মনে হল তার শৌর্য! বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা ব্যাপক ধ্বংসসাধনের জন্য বার করতে পারলেন হাইড্রোজেন বোমা কিন্তু সর্পাঘাতগ্রস্ত একটা মানুষকে সঞ্জীবিত করবার জন্যও বার করতে পারলেন না এমন কোনো সফল ঔষধ, যাতে জনসমাজের উপকার হয়। ধিক চিকিৎসাশাস্ত্র! ধিক বৈজ্ঞানিক!

আর সংস্কার যেখানে ভাঙে, কুসংস্কার সেখানে জাগে। ডাক্তার যেখানে হয় পরাজিত, রোজা সেখানে আসে জিততে।

তাই, একটা প্রাণের কাছে পয়সা কিছুই নয়। একে একে এল গ্রামবাসী, একে একে এল রোজা। গ্রামবাসী ভয়ে কাঁটা হয়ে দেখতে লাগলো মহামায়ার এই মহাপ্রয়াণ আর সতর্ক হয়ে উঠলো নিজেদের প্রাণের জন্য। কী জানি, যদি ফের সাপ এসে কাউকে কামড়ে দেয়। যে যাচ্ছে, সে যাক না। কিন্তু যারা আছে, যারা জীবিত—তাদের তো বাঁচতে হবে।

কেউ কেউ গল্পের ঝাঁপি খুলে ধরলো। নাগ-পঞ্চমীতে কার বাড়িতে বাস্তু সাপ দেখা দেয়, কার বাড়িতে বাস্তু সাপ একেবারে

দুধের মতো সাদা, থাকে ঢুইটিপিতে, বেরুলে একটা না একটা হান হবেই—এইসব ব্যাপার নিয়ে আড়ালে আড়ালে গল্প চালাতে লাগলো। একে গল্প চালানো বলে না—গল্প চোলাই। যার সাহস আছে, সে শুনলো। যার সাহস নেই, সে লণ্ঠনের শিখাটা বাড়িয়ে দিল। বাড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চললো।

অবশেষে রোজায়-রোজায় ঝগড়া। এ বলে, আমি বড়। ও বলে, আমি আরো বড়। তুই কটা বাঁচিয়েছিস? আমরা পাঁচ পুরুষে এই কাজ কচ্ছি!

প্রথম রোজা বলে, বেশ তো, তোর সাধ্যি থাকে তুই বাঁচা। আমারও ক্ষমতা কেমন দেখে নিই!

সন্দীপ শুধু তাদের পায়ে ধরতে বাকী রাখলো।

সময়ের এমনি শক্তি, বড়কেও সে ছোটর পায়ে লুটিয়ে দিতে পারে!

সেই রাত্রেই এল সাতটা নূতন কলসী। সাতটা আমের ডাল। রাঙচিতার গাছ। গামছা। কাঁচকলা। এক বাটি চূণ। কলাপাতা। আরো কতো কী!

মহামায়ার দেহ তখন কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

আগে যদিবা তিনি কিছু কিছু প্রলাপ বকছিলেন, এখন তাও বন্ধ। আর তাঁরই উপর নানা প্রক্রিয়াসহ রোজাদের চলতে লাগলো মন্ত্রপাঠ:

“কেলে কেলে বিষম কেলে বিষে ভরা গা।
মার মার শব্দ করে ব্রহ্মা ছাড়িলেন রা॥

কে মারিল কে গুণিল আদলোকের শ্বাস।
অগ্নিতে পুড়ায়ে মারি কালকুটীর বিষ॥
ব্রহ্ম জ্বালে পুড়ে মল কালকুটের বিষ।
ধবল ঘোড়ায় চড়ি দেবি চাহেন চারি দিক॥
ষোল খানা পা মোর ন্যাড়ের খড়।
মোড়ঙ্গার খড় এনে ইন্দ্র জ্বালে॥
বিষ তখন দেখে শুনে পাক পাড়ে।
দেখা বিষ লাগলে পুয়ো॥
যেখানে পূজে উয়ো পুরো।
উয়ে পুরো নাম শুনে॥
সকল বিষ্ তরায় গণে।
যতেক বিষ মরে ভেবে॥
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে পুরোর আজ্ঞে।”

তারপর চুণ-পড়া ঃ

“চুণ চুণ জগতে জানি।
আমার এই চুণ-পড়ায় বিষ হল পানি॥
হাড়ের ঘর মাসের কুড়ে।
আমার এই চুণ-পড়ার বিষ মল পুড়ে॥”

সব পড়াই শেষ হল। কিন্তু মহামায়া আর জাগলেন না। সেই মহাবরষার রাঙা জল—মহাকল্লোলে বয়ে নিয়ে চললো মহামায়ার মহাপ্রাণকে। যে মৃত্যুযন্ত্রণা পেয়ে তিনি চোখ

বুঝেছিলেন, এই মৃত্যুযন্ত্রণাই তাঁকে সকল ভবযন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিল। ইহজগতের দরজা তাঁর খুললো না। কিন্তু দিব্যজ্ঞানের শত শত দরজা হয়তো একের পর এক খুলে গেল তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর আত্মার অন্তস্থলে। আর বীরেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে একটি মেয়েছেলে বলতে কেউ রইলো না।

মহামায়ার মৃতদেহটা শ্মশানে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা পাকা হল।

বীরেন্দ্রকিশোর তখনি শুধু তাঁর ঘর থেকে বেরুলেন। সন্দীপকে বললেন, তা হলে চলে গেল?

সন্দীপ বাবার ব্যাপারটুকু আদ্যপান্ত লক্ষ্য করেছিল। আর লক্ষ্য করে উত্তরোত্তর বিস্মিত নয়—বিরক্তই হয়ে ছিল। ঢের ঢের মানুষ দেখেছে সে। কিন্তু বাবার মতো মানুষ বুঝি সে কোথাও দেখেনি। নিজের স্ত্রী যন্ত্রণায় ছট ফট করে মারা গেলেন, বাবা একবার এতটুকু সান্ত্বনার বাণী পর্যন্ত শোনালেন না। এতটুকু উদব্যস্ততার চিহ্ন পর্যন্ত তাঁর শরীরে কোথাও দেখা গেল না বাবা ভেবেছেন কী? মরে গিয়ে মা কী ফের ফিরে আসবেন? বাবা ভেবেছেন কী? চোখ রাঙিয়ে তিনি নিজের বাড়িকে বশে রাখবেন?

তাই, যখন বীরেন্দ্রকিশোর প্রশ্ন করলেন—তা হলে চলে গেলে, তখন সন্দীপও কেঁদে তার একটা কড়া জবাব না দিয়ে পারলো না।

বললে, হ্যাঁ, চলে গেলেন। আর এর পর আমিও যাবো।

—তুমিও যাবে? বীরেন্দ্রকিশোর বিন্দুমাত্র দমলেন না। যেন কিছুই হয়নি। যেন এমনি একটা সহজ, সতেজ মনোভাব নিয়েই বললেন, আমি তো ভাবছিলাম, তুমি এখনো কেন রয়েছ? তোমার তো থাকবার কথা ছিল না। বৌমার পিছন পিছনই তো তুমি গেলে পারতে!

সন্দীপ জবাব দিল না বটে কিন্তু সৎকার করতে গিয়েও সে-কথা সে ভুললো না। ভুলতে পারলো না।...

পরদিন এসে সে সত্য-সত্যই দাঁড়ালো। বাবার কাছে, বাবার ঘরের দরজায়। পরনে তার ধুতি নয়, ঘাটে-ওঠা থান, ঘাটে ওঠা শ্বেত উত্তরীয়। বললে, বাবা, তাহলে যাই...

বীরেন্দ্রকিশোর বললেন, যাও।...

সন্দীপও এগুতে লাগলো।...

বীরেন্দ্রকিশোরও ধীরে ধীরে তার পিছু নিলেন।

কিন্তু সিঁড়ির শেষ সীমানায় এসে বীরেন্দ্রকিশোর বোধ হয় আর পারলেন না। আর পারলেন না নিজের বিজয় কেতন উড়িয়ে রাখতে। জয়ের মালা ছুলিয়ে রাখতে।

ডাকলেন, সন্দীপ...

সন্দীপ এই ডাকটারই বোধ হয় আশা করছিল। আশা নয়—অপেক্ষা করছিল। তাই তার চোখ সামনের দিকে থাকলেও, দৃষ্টি ছিল পিছন পানে।

সন্দীপ এগিয়ে এল। আর বীরেন্দ্রকিশোর ভেঙ্গে পড়লেন কান্নায়।

—বাবা। বীরেন্দ্রকিশোর বললেন ধরা গলায়—যাবার কী কোথাও জায়গা আছে রে? যাবার জায়গা থাকলে আমিই তো চলে যেতে পারতাম! আমার যাওয়াটাই তো শোভন হত, সুন্দর হত। কিন্তু এ-গৃহ, এ-সংসার কোথাও—কোনো চুলোয় যেতে দেয় না। যেতে চাইলেই বা তোকে যেতে দেবে কে? এযে সমুদ্র!—ভেসে পড়লেও তরঙ্গ আবার তীরেই ঠেলে দেবে! তাই তুই যা। আমি থাকি। তোর ফিরে আসার অপেক্ষায় আমি থাকি। জীবনে অনেক ভুল করেছি। শাস্তিও পাচ্ছি, আরো পাবো। তাই শেষ সময়, আমায় তোরা ক্ষমা কর। আমি ক্ষমা চাই। আমি তোর অপেক্ষায় রইলাম। ফিরে যখন আসবি—একা আসিসনি বাবা। সঙ্গে প্রদীপকেও আনবি। যেখানেই সে হতভাগা থাক—আমি জানি, তুই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবি। আর যদি—যদি পাস ফিরে সেই গৌরীকে আর তার বাপকে—তাদেরও আনবি। আমি সমাজ মানবো না। আমার টাকা পয়সায় আর দরকার নেই। আমি গৌরীর সঙ্গেই বিয়ে দেব আমার প্রদীপের! আর বৌমাকেও আনবি বৈকি। সে যে আমার ঘরের লক্ষ্মী। আমি ভুল করলেও, তাকে ভুল করতে দেব না—দেব না—দেব না।

বীরেন্দ্রকিশোর সেইখানেই বসে পড়লেন। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। ছেলেমানুষের মতো হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

তেইশ

পুলিস অফিসার রঘুবীরবাবুর মোটর এসে দাঁড়ালো তাঁর বাড়ির গেটে।

রাত্রি তখন সাড়ে সাতটা।

মোটরও এসে দাঁড়ালো আর রঘুবীরবাবুও নেমে ছুটলেন বাড়ির মধ্যে। সামনেই দেখতে পেলেন সুদীপ্তাকে। আর সুদীপ্তাকে দেখেই হাউ মাউ করে উঠলেন—এই যে মা, তুই এখানে, ভারী একটা বিপদ হয়ে গেছে, চট করে আয় দেখি একবার···

সুদীপ্তা যেন সমস্ত বিপদের জন্যই প্রস্তুত! এক বিপদ ঘাড়ে নিয়ে সে এখানে এসেছে, ফের আবার আরো বিপদ?

—কী বিপদ বাবা? সুদীপ্তা না জিজ্ঞেস করে পারলো না। আর মোটরের কাছে যেতেই ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হল।

রঘুবীর মোটর চালিয়ে একাই বাগবাজার থেকে ফিরছিলেন। পথে সহসা একটা দুর্ঘটনা ঘটে। একটি লোক এসে নাকি চাপা পড়তে পড়তে ছিটকে যায়। ছিটকে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় তিনি আর তাকে ফেলে আসতে পারেননি। এসেছেন একেবারে মোটরেই তুলে নিয়ে। এসেছেন সঙ্গে নিয়েই। এখন কে লোক—কার লোক, সে সব খোঁজ পরে হবে! ঘরে তো তোলা যাক।

—ঠিক-ই তো। ঘরে তোলা যাক আপাততঃ।

সুদীপ্তাও সায় দিল।

তারপর চাকর-বাকরের সাহায্যে ঘরেও তাকে তোলা হল। শোয়ানোও হল বিছানায়। আর বলা বাহুল্য, সেবার ভার নিল তার সুদীপ্তাই!

আর তাকে গরম দুধ খাওয়াতে গিয়ে সুদীপ্তা যেন আশ্চর্য নয়—আঁতকে উঠলো। এ কে? এতো পথচারী নয়! এতো তার অপরিচিত নয়। এ যে স্বয়ং উমাশংকরবাবু! যাঁকে তার শ্বশুর নির্দয় ভাবে, নির্মম-চিত্তে বিপদের পথে ঠেলে দিয়েছেন! ষড়যন্ত্র করে যাঁর মূলচ্ছেদকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যাঁকে কূল থেকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে অকূলে—মাটির প্রদীপের মতো। আর যাঁর নয়, যাদেরই দুঃখে—জেহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল সুদীপ্তা। আর যাদেরই প্রতি সুস্নিগ্ধ সমবেদনায় অন্যায়কে, অসত্যকে সে এখনো মেনে নেয়নি। মেনে নিতে পারেনি তার সমস্ত অন্তর দিয়ে!

সুদীপ্তা আর পারলো না। পারলো না চুপ করে থাকতে। তখনি তার বাবাকে গিয়ে চেপে ধরলো।

—বাবা, এঁকে তুমি কোথায় পেলে?

—কেন মা, বলেছি তো সব।

—তুমি তো বলেছ। কিন্তু আমিই কী ভগবানকে কম বলেছি? ঠিক এই লোকটিকেই বাবা বড় দরকার ছিল আজ! বড় দরকার বলেই হয়তো বড় দয়ালু ভগবান এঁকে আজ আনিয়ে

দিল আমার কাছে। তোমার মোটর আর মোটর থাকবে না বাবা, এবার নিশ্চয় ময়ূরপঙ্খী হয়ে উঠবে, দেখবে। খালি—এখন একটি কাজ করো—

—তুই কী বলছিস সুদীপ্তা? এ কে? কী কাজ বল দেখি?

—একটা বড় ডাক্তারকে আনাও আগে…

—সে তো এসেই ফোন করে দিয়েছি ক্যাপ্টেন রয়কে। এখনি এল বলে। কিন্তু এ-কে?

—এ নয়। বলো ইনি। গরীব হলেও এরাই গর্বিত হওয়ার উপযুক্ত। দরিদ্র হলেও ইনি নর নন—নারায়ণ! বাবা, এঁর সম্বন্ধে সব কিছু তুমি জানো। সব কিছু তোমাকে বলেছি। পূজারী ব্রাহ্মণ বলেই সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এঁর বাস করা অসাধ্য হল গ্রামে। স্ত্রীকে পোড়াবার স্বজাতি পেলেন না। বড় চাকরে হলে এঁর মেয়েকেই লুফে নিতে আসতো, কতো বাড়-বাড়ন্ত ঘরের বিলাত ফেরৎ! এঁর স্ত্রীর-ই নিমন্ত্রণ পড়তো কতো বড় বড় পার্টিতে, কতো বড় বড় হোটেলে। বাবা, এই লোকটিই হচ্ছেন—উমাশংকর!

—I see ·· ! ভারী আশ্চর্য তো! রঘুবীর বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলেন না।—কিন্তু এঁর মেয়ে এখন কোথায়?

—সেটা জানতে পারবো উনি জাগলে। এখনো তো অজ্ঞান দেখলাম!

—যাই হোক। তুই একটু দেখ মা গিয়ে…

—দেখছি। কিন্তু বাবা, আরো একটা কথা…

সুদীপ্তা এসে আবদার করে বাবার একটা হাত ধরলো।

বাবা বললেন, কী ?

—সমস্ত ধর্মই বলে—সুদীপ্তা বললে—যিনি ধনবান, তাঁর উচিত দরিদ্রকে দেখা। দরিদ্রকে পালন করা। তা বাবা, তোমার তো পয়সার অভাব নেই। যদি একটা লোক চিরজীবন তোমার আশ্রিতই থাকে, তাকে কী তুমি রাখতে পারবে না ? তাড়িয়ে দেবে ?

রঘুবীর কথা শুনে মৃদু হাস্য করলেন। মৃদু অথচ কতো মধুর! সুদীপ্তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ওরে বোকা মেয়ে, এ-শিক্ষা তো তোকে আমিই দিয়েছি। বাপ হয়ে তোর কথাটা কী আমি বুঝতে পারবো না, ভেবেছিস ? পারবো. পারবো। আমার আশ্রয়ে যদি কেউ সত্যিই থাকে, তাকে কী আমি তাড়িয়ে দিতে পারি রে ? পারি না। আমার দুটি জুটলে তারও জুটবে বৈকি। কিন্তু কথা হচ্ছে, সত্যিই কী তিনি আমার আশ্রয়ে থাকবেন ? তুইও যেমন থাকবি না, তিনিও তেমনি থাকতে পারবেন না,-দেখবি।

—কেন বাবা ? আমি আর কোথায় যাচ্ছি ?

—যাবি রে, যাবি। তোকে ছেড়ে সন্দীপের সাধ্য কী বেশীদিন থাকে ? দেখবি একদিন, সে গুটি গুটি এসে হাজির হবেই। আর এমন কোনো দোষ তুই করে আসিস নি, যাতে তোর শ্বশুরও বেশী দিন তোকে ভুলে থাকতে পারবে। 'সত্যমেব

জয়তে" ! সত্যের জয় হবেই। তখন দেখবি, বাবা যা বলেছে, সত্য কিনা ! ওরে, পুলিস লাইনে থেকে থেকে লোকের মন জেনে জেনে আমি একেবারে জানোয়ার হয়ে গেছি রে বেটি, জানোয়ার হয়ে গেছি !

হাঃ হাঃ হাঃ।

কী দিলখোলা হাসি রঘুবীরের !

সঙ্গে সঙ্গে মোটরের হর্ণ শোনা গেল গাড়ি বারান্দা থেকে।

ক্যাপ্টেন রয় এতক্ষণে এসে গেলেন।

সুস্থ হতে বেশী সময় লাগলো না উমাশংকরের। সামান্য পেনিসিলিন, যথাযোগ্য বিশ্রাম—তারপরই তিনি চোখ মেললেন। আর চোখ মেলেই চারিধার দেখে—চোখ তিনি ঘোরাতে লাগলেন। এ কোথায় এসেছেন ? এত বড় বাড়ি, এমন টেবিল-চেয়ার, সোফা-আয়না এমন সুখকর শয্যা—স্বপ্ন দেখছেন না তো ?

—কেমন বুঝছেন এখন ? বীণানিন্দিত স্বরে কথা বলে সুদীপ্তা। কথা নয়—সুর। উমাশংকরের চুলের মধ্যে সে হাত দিয়ে দিয়ে তাঁর ক্লান্তি দূর করে।

—তুমি কে মা ? উমাশংকর প্রশ্ন করেন. তোমায় তো কখনো দেখিনি।

—আমি আপনার মেয়ের মতোই আর এক মেয়ে বাবা। আমাকে চিনতে আপনার খুব অসুবিধে হবে না। আপনি প্রদীপকে চেনেন তো ?

—প্রদীপ···প্রদীপ···উমাশংকর কেঁদে ফেললেন, তাকে আবার চিনি না ?

পরক্ষণে নিজেকে বোধ হয় তিনি সামলে নিলেন। বললেন, চিনেই বা আর লাভ কী ? সে এখন কোথায় ?

—মাঝে তার খুব অসুখ করেছিল। এখন শুনছি, সেরেছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। তাকে হয়তো একদিন দেখতে পাবেন।

—কী বললে, কী বললে মা ? তাকে দেখতে পাবো—দেখতে পাবো ?

উত্তেজিত হয়ে পর মুহূর্তেই তিনি মিইয়ে গেলেন।— দেখেই বা আর লাভ কী ?

—লাভ লোকসানের কথা ভগবান জানেন। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ক্ষতিয়ে দেখবেন। আপনার-আমার সাধ্য কী তা বোঝা ?

—ঠিক বলেছ মা, তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি কে—বললে না তো ?

—আমি সেই প্রদীপের বৌদি। বীরেন্দ্রকিশোরের পুত্রবধূ।

—অ্যাঁ, এখানেও তিনি। উমাশংকর মরিয়ার মতো খাট থেকে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন। ধরে ফেললো তাঁকে সুদীপ্তা।

—আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ? সুদীপ্তা তাঁকে অভয় দিল, এখানে তাঁরা কেউ নেই। এটা আমার বাবার বাড়ি। আপনি যেমন গাঁ থেকে পালিয়ে এসেছেন, আমিও তেমনি পালিয়ে এসেছি শ্বশুরবাড়ি থেকে।

—কিন্তু তুমি তো মা একঘরে হওনি। একঘরে না হয়েও আমায় কেন এনেছ এখানে ?

সুদীপ্তা দেখলো, উমাশংকরের ঘোর এখনো ঠিক কাটেনি। তাই বললে, আপনি মোটর চাপা পড়েছিলেন। আপনাকে আমার বাবা এখানে এনে রেখেছেন। কিছু ভাববেন না আপনি, সারা জীবন আপনাকে এখানে থাকতে হবে। আমরা থাকতে আপনাকে একঘরে করে—সাধ্য কার ? আর এখানে আপনার একটুও ভয় নেই। আমার বাবা একজন পুলিসের লোক।

—মোটর চাপা পড়েছিলাম ?··· পুলিসের লোক ? ভগবান মঙ্গল করুন মা তোমার। কিন্তু না ভেবে কেমন করে পারি মা ? আমার গৌরী—আমার গৌরীকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না···

সুদীপ্তা সমস্ত খবর একে একে জানলো। জেনে নিল। দেশ থেকে ভোর বেলা উঠে আসার পর উমাশংকর কোথায় এসে—কী ভাবে উঠলেন, সুদীপ্তা জানলো।

সুদীপ্তা প্রশ্ন করলো, আপনি বিশ্বাস করেন গৌরীর স্বভাব খারাপ ?

—না মা। উমাশংকর বললেন, এসব সমাজের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু বলে আমি ভাবি না। আমার মেয়েকে আমি খুব চিনি। তবে স্টেশনে নেমে সে রণজিতের বাড়ি যেতে আপত্তি করে।

—রণজিৎকে কী আপনি সন্দেহ করেন ?

—এ কদিন তার ব্যবহার যা দেখলাম, তা সন্দেহের অতীত। সে তুমি গৌরীকেই জিজ্ঞেস কোরো। ও বাড়ির ঠিকানা আমার মনে নেই। তবে লেখা আছে একটা কাগজে।

কাগজটি বার করে উমাশংকর সুদীপ্তার হাতে দিলেন এগিয়ে।

বেলা তখন সাড়ে চারটে।

একখানা মোটর ছাড়লো রঘুবীরবাবুর গাড়িবারান্দা থেকে।···ঝকঝকে, তকতকে মোটর। সে-মোটরে উঠে বসলো সুদীপ্তা। সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজা।

চব্বিশ

ডাক্তারখানায় ব্যণ্ডেজ বেঁধে রণজিৎ সেই যে বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি। উমাশংকরের খোঁজেই ঘুরছে। এদিকে গৌরীও আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পড়ে আছে শয্যায়। ঘুমুচ্ছে বললে ভুল হবে। ঘুমোবারই ভাণ করে ভাবছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছে। চোখ দিয়ে তার কতো অশ্রুই বেরুলো, কতো অশ্রুই শুকুলো।

উমাশংকর গেলেন, প্রদীপদাও গেল। আর কী তার বাবা ফিরবেন ? সমস্ত রাত মানুষটার কোনো পাত্তা নেই। আর সমস্ত দিন। দিন শেষ হতে আর কঘণ্টাই বা বাকী ? বাবার কোনো খোঁজ নেই। আর ঠিক এই সময়ে যে মানুষটা তাদের বুক দিয়ে রক্ষা করছে, তত্ত্বাবধান করছে তারই কাছে ধুমকেতুর মতো আবির্ভাব ঘটলো প্রদীপদার। একি ভুল ধারণা নিয়েই সে চলে গেল। একি অন্যায়, অসঙ্গত তার ব্যবহার। একি সৃষ্টিছাড়া, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তার উন্মাদ উদ্‌ঘাটন !

গৌরীর আর রক্ষা নেই। গৌরীর আর গর্ব নেই। মৃত্যু—মৃত্যুই তার অন্ধকার জীবনের এখন একমাত্র আলোকবর্তিকা। তার নব জীবনের উদ্ধত নিশান। মৃত্যু আর মা—দুটোই এখন তার কাছে বড় মধুর, বড় মনোজ্ঞ। মৃত্যু নয়—তার মা তাকে ডাকছেন, গৌরী, গৌরী, চলে আয় ! আমি তেকে সুখ দেবো।

চরম সান্ত্বনার পরম-পথ আমি তোকে দেখিয়ে দেবো। তুই ভাবছিস কেন? উঠে পড়্, উঠে পড়্ গৌরী।

—গৌরী. উঠে পড়ো। আমি এসেছি।.

সুকোমল, সস্নেহ একখানি হাত এসে গৌরীর মাথায় স্থির হল। আর, সে-হাত আহিতলক্ষ্য, সুপ্রশস্তহৃদয় সুদীপ্তার।

সুদীপ্তা বললে, গৌরী, উঠে পড়ো। আমি এসেছি।

আমি এসেছি। একি স্বপ্ন দেখছে গৌরী। না, তার অস্থির মনের অপটু কল্পনা?

ধড়মড় করে উঠে পড়লো—উঠে পড়লো গৌরী তার চাদরের চোরাবালি থেকে। নির্গত হল চাদরের নির্মোক থেকে।

—একী, আপনি। গৌরী মুগ্ধ, সম্মোহিত চোখে চাইলো সুদীপ্তার পানে। মুহূর্তের জন্য তার মনে আবার ফিরে এল বাঁচবার আশা, নবজীবনের জল্পনা। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই।

পরক্ষণে ফের সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম করলো।

—দিদি, আপনি এসেছেন—বসুন। কিন্তু বড় দেরিতে—বড় দুঃসময়ে আপনি এলেন।. আপনাকে বসতে জায়গা দেবার মতো আমার ক্ষমতা নেই। তবু, আপনি বসুন।

—বসতে আমি আসিনি বোন। বসবার জায়গা অনেক, সে-সময়ও আলাদা।

সুদীপ্তা দাঁড়িয়েই রইলো···

গৌরী ভেঙ্গে পড়লো। সুদীপ্তা সোজা রইলো।

—তোমার বাবার খবর কী? সুদীপ্তা গম্ভীর হবার ভাণ করে এ প্রশ্ন না করে পারলো না।

— বাবাকে কাল রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

গৌরী ফোলা ফোলা চোখ দুটো নিয়ে সুদীপ্তার দিকে চাইলো। শুধু তার ফোলা ফোলা চোখেই নয়, মাথার আলুথালু কেশেও ভয়াবহ ব্যর্থতা।

সুদীপ্তা বললে, যদি শোনো কোনো দুঃসংবাদ?

—আপনি কী পরিহাস করতে এলেন এতদিন পরে আমার এই অবস্থা দেখে? গৌরী যেন উন্মাদিনীর রূপ নিল।—যদি দুঃসংবাদই শুনি, আপনি তাতে খুশি হবেন তো?

—ছিঃ···বোন! আমি কী পরিহাস করবার জন্যেই তোমার কাছে এসেছি, না, সেই আমার বৃত্তি? তুমি আর কী, জানবে? জানলে নিশ্চয় একথা আজ আমায় তুমি বলতে না।

সুদীপ্তা দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করলো গৌরীকে। আর শুধু আলিঙ্গন-ই নয়। গৌরীর মাথাটা টেনে আনলো সে তার নিজের বুকের উপর। তার মাথায় হাত দিয়ে, কপালে চুমু খেয়ে সুদীপ্তা বললে, আমি এসেছি এখানে পরিহাস করতে নয়, আর বসতেও নয়। এসেছি পরিত্রাণ করতে আর তোমায় বসাতে তোমারই বাবার কাছে। চলো ভাই, আর দেরি কোরো না। তোমার বাবা তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন।

—আমার বাবা আমার পথ চেয়ে বসে আছেন? আপনি

কী বলছেন দিদি ? গৌরী খাট থেকে নামতে গিয়ে বোধ হয় পড়ে যাচ্ছিল। সুদীপ্তা তাকে ধরে ফেললো।

—হ্যাঁ, তোমার-ই বাবা। সুদীপ্তা বললে, কাল তিনি মোটর চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছলেন। আমার বাবা তাঁকে নিয়ে গেছেন আমাদের বাড়ি।

—শেষকালে মোটরচাপা ! গৌরী কাঁদতে গিয়েও আনন্দে আটখানা হয়ে উঠলো।

—একটা উপলক্ষ্য তো চাই ! নইলে মিলনাত্মক নাটকের আর সৃষ্টি হয় কী করে ? সুদীপ্তা বললে, ভগবানকে তুমি দোষ দিতে পারো না। তাঁর মতো রস-স্রষ্টা দ্বিতীয় কেউ নেই। মানুষকে তিনি লেজ দেননি, কিন্তু ছাগলকে দিয়েছেন দাড়ি। মেয়েদের গোঁফ নেই কিন্তু মেয়ে বিড়ালের মুখে গোঁফ দিয়েছেন !

—কিন্তু এই মুহূর্তেই কী যাওয়া সম্ভব দিদি ? রণজিৎদা আমার মুখ চেয়ে আমার বাবাকে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সারাদিন তার খাওয়া হয়নি। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত···

তারপর যাবতীয় ঘটনা, যতো কিছু ব্যাপার—গৌরী আর শোনাতে বাকী রাখলো না সুদীপ্তাকে।

শুনতে শুনতে কোথাও সুদীপ্তার চোখ জ্বলে উঠলো, কোথাও পরিম্লান হয়ে নিবে গেল। সুদীপ্তাও তার কথা জানালো গৌরীকে। আর এক বাক্যে নিন্দা করলো প্রদীপের এই বাড়ি চড়াও হয়ে মারতে আসাটাকে। রণজিতের দোষ থাকলেও

বিপদের দিনে তার এই বিপত্তিভঞ্জক ব্যবহারকে সে শ্রদ্ধা করলো, সে সম্মান দেখালো। আর লোকটিকেও দেখতে তার আগ্রহ এল খুব সহজেই।

আর যাতে আগ্রহ—তাতেই সিদ্ধি!

খানিক পরেই ফিরে এল রণজিৎ হতাশ হয়ে। কিন্তু যখন সে শুনলো—উমাশংকরের এই উজ্জ্বল অবস্থিতি, আর পরিচয় পেল সুদীপ্তার, তখন যে, সে কি করবে—কিছুই ঠিক করতে পারলো না। প্রথমেই তো একবার পায়ের ধুলো নিল সুদীপ্তার। বললে, বৌদি, গরিবের বাড়ি আজ ধন্য হল। প্রদীপ মেরেছে, একশোবার মারুক্। সন্দীপদাও যদি এসে মেরে যায়, হাসিমুখে সে-মার সহ্য করবো। কিন্তু আপনাকে কিছুতেই আমি যেতে দেব না মিষ্টিমুখ না করিয়ে। আপনি ভেবেছেন, 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি'—মানে এত বড় মোটর দেখেই আমি ভয় পাবো? সে বান্দা আমি নই। আগে পেটটি পুরে খাবেন তবে আমি আমার বোনকে ছাড়বো। জানেন? কাল রাত থেকে রোজা করে রয়েছি। সে-রোজা না ভাঙ্গিয়েই আপনি চলে যাবেন নাকি? যান দেখি একবার…

যেরকম ভাব দেখালো রণজিৎ তাতে কে না বলবে সে একটা মস্ত বীর?

সুদীপ্তা হাসিমুখেই সম্মতি দিল: বেশ তো, একবার খাবার আনিয়ে দেখুন-ই না…

খাবার তো নয়—প্রচুর জলযোগ!

দিদি পরিবেশন করলেন মিষ্টান্ন, রণজিৎ পরিবেশন করলো—চা।

গৌরী যাবার আগে রণজিৎকে প্রণাম করতে এল।

রণজিৎ বললে, বটে! ছেড়ে দেব বললেই বুঝি ছেড়ে দেওয়া যায়? আর, আমি বুঝি মোটর চাপবার কেউ নেই?

গৌরী বললে, আপনি আবার মোটর চাপবেন কী? সকলেই যদি—মোটর চাপে, চাপা পড়বে কারা?

—দেখুন! দেখুন বৌদি! রণজিৎ লাফিয়ে উঠলো, যাবার সময় কী রকম প্রার্থনাটা করে গেল দেখুন। আমার ছেলে মেয়ে, আমার স্ত্রী আছে। আর আমি কিনা মোটর চাপা পড়বো! তোমাকে যে বিপদের দিনে এত করে বাঁচালাম—এই বুঝি আমার পুরস্কার! মেয়েরা তো ভারী বজ্জাৎ দেখছি!

—ওমা! আমি বুঝি তাই বলছি! লজ্জায় জিব কাটলো গৌরী।

সুদীপ্তা ভৎর্সনা করলো, ছি, ওই রকম বলে নাকি আবার? ওঁর কাছে ক্ষমা চাও।

—থাক থাক। রণজিৎ বললে, সম্পর্কটা দেখতে হবে তো! ওকে বোন বললে কী হবে—ওযে আমার এক নম্বর শালী।

তারপর গৌরীর দিকে চেয়েঃ চলো, আমিও তোমার

সঙ্গে যাবো। বাপ তো তোমার একলার নয়, তাঁর উপর আমারও অধিকার রয়েছে! আমিই বা তাঁকে ছাড়বো কেন?

মোটর যখন স্টার্ট দিচ্ছে, সুদীপ্তা বললে, কৈ, আপনি উঠলেন না যে!

—আমি আর যাবো না। রণজিৎ বললে।

—বারে! সুদীপ্তা বললে, আপনি এত সহজেই ছেড়ে দিচ্ছেন গৌরীকে! একবার দেখে আসবেন না, কোথায় গিয়ে সে উঠছে। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে চললাম কিনা!

—ভুলিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আপনার সত্যিই আছে বৌদি। কিন্তু হাতটার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। ঠিকানা তো রেখেছি; আর একদিন যাবো। ছোট ভাই বলে আপনি যে আমাকে ক্ষমা করে যেতে পারলেন, এইটেই আমার জীবনে বড় সঞ্চয় হয়ে রইলো।

পঁচিশ

কোথা থেকে কোথায় !

কোন্ এক গণ্ড গ্রাম। তারপর বিরাট সহর—কলকাতা, রণজিৎদার বাসা। আর সেই বাসা থেকে সুদীপ্তার প্রাসাদ ! ভাবতেও অবাক হয়ে যেতে হয়। ভাবতেও কল্পনা চোট খায় ! কোন এক তক্তাপোষে পড়ে পড়ে মানুষ হয়েছে গৌরী। চেটাইয়ে বসে বসে মহাভারত শুনিয়েছে তার মাকে, পুকুরে গিয়ে গিয়ে কাপড় কেচে এসে উঠেছে মাটীর রোয়াকে। হ্যারিকেন আর কুপ্পির আলো নিয়ে নিয়ে রাত্তিরে কাজ সেরে ফিরেছে, কঞ্চি আর বেঁকারির সাহায্যে ধরিয়েছে উনুন, ভাঙা আরসী আর ক্ষাটা চিরুণী দিয়ে দিয়ে বেঁধেছে চুল। দড়ির আলনায় ঝুলিয়েছে শাড়ী আর সেমিজ। ঘুঁটের ছাই দিয়ে দিয়ে মেজেছে দাঁত !

কোথায় আর কোথায় ! সেখানের সঙ্গে এ-বাড়ির কতোটুকু যোগাযোগ ? কতোটুকু ঐক্য ? এ যেন নরক থেকে স্বর্গ। মায়া থেকে মোক্ষ ! অন্ধকার থেকে অরুণালোক ! এখানে তক্তাপোষ নেই। তার বদলে খাট-পালঙ্ক। চেটাই নয়, সোফা আর চেয়ার। চেয়ার আর কৌচ। পুকুর নয়—বাথরূম। জল নোংরা নয়—পাইপের। পরিশ্রুত। হ্যারিকেন-কুপ্পি এখানে অচল। শুধু ইলেকট্রিক আলো···ইলেকটিক ফ্যান···ইলেকট্রিক রেডিয়ো, ইলেকটিক হিটার। আর ভাঙা আয়না নয়। বড়

বড়—গোটা গোটা দেওয়াল-আর্সী! সেগুলি দিনের মতোই স্বচ্ছ, দিনের চেয়েও দীপ্তিমান! আর কতো রকমের প্রসাধন-সামগ্রী! মাথার চুলে মাখবারই কতো রকমের সুগন্ধি তেল। তারপর লোসন, ক্রীম, হিমানী, শাদা, গোলাপী আর লাল পাউডার। কাপড়-জামা রাখবার এখানে—দড়ির আলনা নয়। স্ট্রাণ্ড! আর ঘুঁটের ছাই দিয়ে এ-বাড়ির একটা চাকর পর্যন্ত দাঁত মাজে না। ঘুঁটের ছাইয়ের কল্পনা করতেও তারা ভয় পায়।

এ-হেন বাড়িতেই স্থান পেয়ে গৌরী যেন ভাবলো এটাকে ঐশ্বর্যের ইমামবাড়ি! ঈপ্সিতের ইন্দ্রপুরী।

কিন্তু এ ইন্দ্রপুরী তার কাছে কদিনের? এর উপর অধিকারই বা তার কতোটুকু? এখানে থাকার ভিত্তির আয়ুই বা কতোদিন?

সুদীপ্তা দু'দিনেই কিন্তু ভোল ফিরিয়ে দিল গৌরীর। তাকে নূতন নূতন শাড়ীতে, নূতন নূতন প্রসাধনে, নূতন নূতন অলঙ্কারে যেন প্রকৃতি থেকে প্রতিমায় পরিবর্তিত করলো। ফিরিয়ে আনলো। যেন পাষাণে দিল প্রাণ। সুরে দিল—স্বর, ভাবে—দিল ভাষা।

গৌরী ইতিমধ্যেই শুনেছিল, সুদীপ্তা শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে। আর সে, চলে যে এসেছে সে-সুধু তাদেরই কারণে। এর জন্য তার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

গৌরী বলে, দিদি, আপনি আমাদের জন্যে তো অনেক কিছুই

করলেন কিন্তু আপনার জন্যে আমরা যে কী করতে পারি, কিছুই জানি না। শেষ পর্যন্ত সত্যিই কী আপনি আমাদের বাঁচাতে পারবেন, নিজেকে না বাঁচিয়ে?

—আমার বাঁচবার আদর্শটা একটু অন্য রকমের গৌরী। সুদীপ্তা জবাব দেয়: তাই এই তথাকথিত বাঁচবার হাত থেকে আমি বাঁচতে চাই। আমি জানি, আমার মূল্য কতোখানি, তাই এই অমূল্য সুযোগকে হেলায় হারাবো না অন্যায়ের কাছে নতি-স্বীকার করে। তাতে যদি আমার স্বামী বিচলিত হয়—হোক। শ্বশুর যদি না নেয়—শোক কী? আমি জানি, তোমাদের বাঁচাবোই—নিজেকে না বাঁচিয়েও।

আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিল সুদীপ্তা, সহসা সেখানে কার আগমন ঘটলো। আর বিদ্যুতের মতো দ্রুত, দৌড়ে পালিয়ে গেল গৌরী, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে।

আগমন যার ঘটলো, প্রকাশ যার পেল, সে আর অন্য কেউ নয়। স্বয়ং প্রদীপ। আর প্রদীপকে দেখে, এতদিন পরে তাকে কাছে পেয়ে সুদীপ্তা বললে, বোসো। আগে একটা কবিতা শোনাই তোমায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে তোমার আবাহন হোক, অরবিন্দের বাণী দিয়ে তোমার বিসর্জন হবে।

“হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে—"

তারপর তোমার দাদাটি কবে আসছে ?

প্রদীপ একটি চেয়ারে বসলো। বিশৃঙ্খল তার বেশবাস, বিশৃঙ্খল তার মাথার চুল। চেহারায় চাকচিক্য বলতে শুধু তার দুটি চোখের অলস-চাহনি। আর সব ভূযো। সব ভুয়ো।

প্রদীপ বললে, দাদা কবে আসছে আমি জানি না। আজ অবধি আমি বাড়ি যাইনি। তবে আমি যে এসেছি, এইটেই এখন বড় বাস্তব !

—সে তো উপলব্ধি করতেই পারছি। সুদীপ্তা বললে, নন্দিতার কাছ থেকে তো কয়েকদিন হল ছুটি পেয়েছ শুনলাম, তারপর, এ কদিন ছিলে কোথা ?

—ভেবেছিলাম মরবো কিন্তু মরা হল না।

—কেন, বাধা কী ছিল ?

—বাধা নিজেই।

—তারপর ?

—তারপর মনস্থির করতে এক বন্ধুর মেসে গিয়ে উঠতে হল।

—এত টাকা কোথায় পেলে ? বন্ধু কী গৌরী সেন নাকি ?

—গৌরী সেন কিনা জানি না। তবে বন্ধু—বন্ধুই !

—আচ্ছা কেন বলো দেখি পরের মেয়ের প্রেমে পড়ে ছেলেরা মরতে চায় ? কৈ, ঘরের মায়ের প্রেমে পড়ে তো

কাউকে আত্মহত্যা করতে শুনলাম না! মা যে এত কষ্ট করে মানুষ করলো, দশ-মাস দশদিন পেটে ধরে লালনপালন করলো, তার প্রেমের কী কিছুই দাম নেই?

—এ প্রশ্নের জবাব আমার কাছ থেকে আর চেয়ো না বৌদি। তুমি কী ইঙ্গিত করছো—আমি জানি। আম বুঝতে পেরেছি। আমি সত্যই অপরাধী। কিন্তু কী করবো? সময় বিশেষে—অবস্থাও—মানুষকে অমানুষ করে তোলে। অবস্থাও, মানুষকে তার দাস করে ঘোরায়।

—দাসই যখন হয়েছিলে, দস্যিবৃত্তি করতে তো তোমায় কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। অমন ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, গুণ্ডা হয়ে উঠলে কেন?

—তোমার কাছে এসেছি কী শুধু বকুনি খাবার জন্যে? আর কিছু খেতে দেবে না?

—তুমি যে আসবেই—সুদীপ্তা বললে, আমি জানতাম। তবে জানতাম না, ঠিক এই মুহূর্তেই আসবে। আসবার সময় তোমার পার হয়ে গেছে। পার যখন হয়েছে, তখন—তুমিও পার পাবে না। অপেক্ষা করতেই হবে—অনুকূল অবস্থার জন্যে।

—যাক, তবু আশা পেলাম।

—আশাই পেলে কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারবে কিনা—সে তুমিই জানো। দেখো, এখন তোমার ভাগ্য আর আমার হাতযশ।

খানিক পরেই প্রদীপের সামনে এল প্রচুর খাবার।

আর সে-খাবার যে বয়ে আনলো সে আর অন্য কেউ নয়—স্বয়ং গৌরী। রূপ যার শুধু রূপ নয়, তরলিত চন্দ্রিকা। আর বর্ণ শুধু বর্ণ নয়। বর্ণে যে—চন্দন-বর্ণা! তার দিকে চেয়ে—তাকে লক্ষ্য করে প্রদীপ আর চোখ ফেরাতে পারলো না! এই ঐশ্বর্যের মন্দির না হলে কী গৌরীকে মানায়? এই সৌন্দর্যের শ্বেতপাথর না হলে কী গৌরীকে শোভা পায়?

খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সুদীপ্তা সরে পড়েছিল।

প্রদীপ ডাকলো, গৌরী।

গৌরী কিন্তু কোনো জবাবই দিল না।

প্রদীপ পুনরায় ডাকলো—গৌরী!

আর গৌরী এতক্ষণে জবাব দিল, আপনি কাকে গৌরী বলছেন, বুঝতে পারছি না। আমি গৌরী নই।

—গৌরী নও? তবে তুমি কে?

—আমি নন্দিতাদির বোন, আজ এসেছি বেড়াতে এখানে।

—ওরে বাপরে। তুমি যে আমাকে বোকা না বানিয়ে আর ছাড়বে না দেখছি। কিন্তু আমি যদি তোমায় বোকা বানাই এখন, তাহলে আমায় কী দেবে?

—আমি আপনাকে একটা ছড়ি উপহার দেব!

—কিন্তু তার আর এখন কোনো প্রয়োজন নেই। আমি সকালেই গিয়েছিলাম রণজিতের কাছে। মারামারি করবার জন্যে নয়, মার খেতে। কিন্তু মানুষটা এত উদার, হাতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তবু আমাকে মারলো না। আমাকে সে ক্ষমা

করলো। আর শুধু ক্ষমা নয়, ভগবানের নাম নিয়ে শপথও করলো, গৌরী তার বোন। একদিন প্রবৃত্তির তাড়নায় সে যে কু-কাজ করতে গেছলো তাতে নাকি তার সামান্য শাস্তিই হয়েছে সে বললে। আর এই মার খাওয়ার জন্যে সে দুঃখিত নয়, সে আনন্দিত। আনন্দিত হয়েই সে অভিনন্দন জানালো আমাকে।

—আর তুমি কী করলে?

গৌরীও ফের জিজ্ঞেস না করে পারলো না। চোখে তার অশ্রুকণা···

জবাব দিল প্রদীপ : কিছু করিনি। কিন্তু যা করণীয় তাই করবারই এখন শক্তি চাই। শুধু পতাকা চাইলেই তো হয় না, তাকে বহন করবার শক্তির জন্যেও সর্বশক্তিমানের কাছে আশীর্বাদ চাইতে হয়।

—সে আশীর্বাদ তুমি পাবে।

সহসা ঘরে ঢুকলো সুদীপ্তা। সুদীপ্তা আড়াল থেকে সব শুনছিল। আর শুনছিল বলেই সে বলতে পারলো, পুরুষ বড় কিন্তু পুরুষকার তার চেয়েও বড়। পুরুষ হয়ে যে পুরুষকারের সাধনা করতে পারে তার বড় পুরস্কৃতিই তো তাঁর আশীর্বাদলাভ।

কিন্তু তাঁর এই আশীর্বাদই কী কখনো অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়? কে জানে? কে বলতে পারে তা? যদি নাই দাঁড়ায় তবে অমন বেশে কেন এসে দাঁড়ালো সন্দীপ?

মুখে এক মুখ দাড়ি, গলায় উত্তরীয়, হাঁটুর উপর আধময়লা কোঁকড়ানো একখানা থান, খালি পা, হাতে কুশাসন!

—একি ! একি ! দৌড়ে এল সুদীপ্তা। সুদীপ্তা যেন বিস্ময়ে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

আয় প্রদীপ তখনো খাচ্ছিল। খাওয়া ফেলেই যে জড় স্নায়ুপিণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে উঠলো।

উমাশংকর সেখানে ছিলেন না। থাকলে তিনি কী করতেন জানি না কিন্তু গৌরী ছিল সেখানে । গৌরীও বিমর্ষ, জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

আর সন্দীপই সুরু করলো তার কথা।—চলে গেলেন···

—কে চলে গেলেন ? কথাটা বলতে গিয়েও সামলে নিল সুদীপ্তা ঃ বাবা নয় তো !

সন্দীপই বললে, কিছুতেই বাঁচাতে পারা গেল না। শেষকালে সর্পাঘাতে মায়ের মৃত্যু হল।

এতখানি অভাবনীয় ব্যাপার স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে নি। আর মানুষ যা ভাবতে পারেনি—ভগবান তাই ভাবালেন।

চোখের জল রোধ করা প্রদীপের দুঃসাধ্য হল।···

ছোট ছেলে বলে মা তাকে সব চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন বলেই হয়তো প্রদীপ তাঁকে ভালো মতো আঘাত দিতে পারলো তাঁর শেষ সময়ে। এ দুর্ধর্ষ দুঃখ—এ কণ্টকিত কলঙ্ক—সারা জীবনেও প্রদীপ মুছতে পারবে না। তিল তিল করে সে দগ্ধ হবে, তবু দ্রবীভূত হতে পারবে না আর মহিমার্ণব মাতৃস্নেহে।

মা···মাগো···প্রদীপ কেঁদে লুটিয়ে পড়লো।

এই রকম করে গৌরীও একদিন কেঁদে ছিল। মা তবু তার চলে গেলেন। যাবার সময় হলে কেউ আর দাঁড়ায় না। কেউ আর পিছনে চায় না। গৌরীও মাতৃহীনা, প্রদীপও আজ মাতৃহীন! এর পর কতো সমস্যা দেখা দেবে। কতো সম্পর্কের সামিয়ানায় ফুটে বেরুবে কতো ছিদ্র, তার ঠিক কী!

গৌরীও তাই—সেই দুর্দিনের কথা স্মরণ করে কেঁদে দিল।

কিন্তু কাউকে আর বেশীক্ষণ কাঁদতে দিল না সন্দীপ।

বললে, কাঁদবার সময় এখন অনেক। কাঁদাবার জন্যে আমি তোমাদের কাছে আসিনি। এখন ওঠো, জাগো, তৈরী হও। মা গেছেন কিন্তু বাবা আছেন। সেই বাবার-ই কথা মনে করো। আসবার সময় দেখেছি, তাঁর সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। তিনি আমার দু'টি হাত ধরে বললেন, জীবনে অনেক ভুল করেছি। শাস্তিও পাচ্ছি। আরো পাবো। তাই, শেষ সময় আমায় তোরা ক্ষমা কর। আমি ক্ষমা চাই। আমি তোর অপেক্ষায় রইলাম। ফিরে যখন আসবি, একা আসিসনি বাবা। সঙ্গে প্রদীপকেও নিয়ে আসবি। যেখানেই সে-হতভাগা থাক, আমি জানি তুই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবি। আর যদি—যদি পাস ফিরে সেই গৌরীকে আর তার বাপকে, তাদেরও আনবি। আমি সমাজ মানবো না, আমার টাকা পয়সায় আর দরকার নেই। আমি গৌরীর সঙ্গেই বিয়ে দেব আমার প্রদীপের। আর বৌমাকেও আনবি বৈকি……

রঘুবীরের পান্থশালা পরদিনই শাদা হয়ে গেল।

এদিকে ট্রেন যখন ছাড়ে-ছাড়ে, গার্ড যখন বাঁশী দিয়েছে, দেখা গেল—দৌড়ে এক যাত্রী এসে ট্রেনের হাতল ধরে উঠে পড়লো গাড়িতে। উঠে পড়লো সেই কামরাতেই যেখানে এসে আগে থাকতেই বসে আছে—প্রদীপ আর গৌরী, সন্দীপ আর সুদীপ্তা। আর একাকী, নির্জনে উমাশংকর।

—একি, রণজিৎদা! আপনিও এই ট্রেনেই নাকি?

গৌরী আর না বলে থাকতে পারলো না।

আর সকলের দিকে চেয়ে রণজিতের সে কী স্ফূর্তি। সে কী উল্লাস।—তাই তো। আমিই বা এ-ট্রেনে কেন?

সুদীপ্তা বললে, বলবো, আপনিই বা এ-ট্রেনে কেন?

—কাউকে বলতে হবে না তাহলে। আমিই বলছি। রণজিৎ বললে, আপনাদের তো ব্যবস্থা একরকম করেই ফেলেছেন। কিন্তু আমারও একটা ব্যবস্থা হওয়া তো দরকার। একটা কবিতা শুনুন:

বর্ষার জল পান করে ফেলে সুফলা ধরা,
তা হতে বৃক্ষ আপনার লাগি শোষণ করে।
সাগর শুষিছে বায়ুরে, তপন কখন ত্বরা
সাগরেরে শোষে, তা হতে চন্দ্র শুষিছে পরে॥
এই যদি হয়—ভেবে দেখো তবে, আমি বা কেন—
সবাই যখন পান করে, থাকি তৃষিত হেন?

আবৃত্তি শেষ করে রণজিৎ প্রশ্ন করলো তার পরিচিত জগতকে ঃ কেমন কবিতা ?

সুদীপ্তা বললে, ভালো। কিন্তু এর মানে বুঝতে পারলাম না তো!

—মানে বুঝবেন কেমন করে ? মানে বোঝবার চেষ্টা করেছেন ? সকলেরই তো ব্যবস্থা হল, আমিই বা তৃষিত থাকি কেন ? বিয়ে যখন করেছি আর স্ত্রী যখন জীবিত আর ছেলে মেয়েও যখন বর্তমান তখন নিশ্চয় আমার একটা দায়িত্ব আছে বৈকি! হাজার মূর্খ হই আর স্ত্রী হাজার মুখরা হোক তবু রাজযোটক মিল হবেই। কতোদিন আর তাদের ছেড়ে থাকবো ? ছেড়ে থাকলেই বা সুখ কৈ ? তাই সদোদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই···বুঝছেন না···তাদের আনতে যাচ্ছি।

সুদীপ্তা বললে, সাধু···সাধু। মশাই, আপনি ঘাঁটাতেই শুধু ঘটক নন, কথাতেও কথাকুশল।

আর ট্রেণ যখন ছেড়ে দিল—সেই নির্জন, নিস্তব্ধ হৃদয় থেকে স্বর বেরুলো। স্বর বেরুলো উমাশংকরের—আশীর্বাদ করি, সুখী হও।

—শেষ—

লেখকের ঃ—

উপন্যাস

নহ একাকী

প্রেমের সমাধি তীরে

তোমার-ই হউক জয়

অগ্নি-অভিষেক

অনুবাদ কাব্য

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

ব্যঙ্গ কবিতা

বেঙাচি

গাথাকাব্য

বাঁশীর ডাক

গল্প গ্রন্থ

সমুদ্র

বিপ্লবের বিয়ে

হে প্রিয় বান্ধবী

ইংরাজী গ্রন্থ

RIPPLES (An English Translation of Author's Bengali Poems)